আমাদের সুভাষচন্দ্র

পবিত্র সরকার

C M Y

আমাদের সুভাষচন্দ্র

আমাদের সুভাষচন্দ্র

পবিত্র সরকার

জাতীয় সাহিত্য প্রকাশ

আমাদের সুভাষচন্দ্র

পবিত্র সরকার

প্রকাশক : কমলকান্তি দাস, জাতীয় সাহিত্য প্রকাশ, বেইজমেন্ট : ৫৫, কনকর্ড এম্পোরিয়াম শপিং কমপ্লেক্স, ২৫৩-৫৪ এলিফ্যান্ট রোড, কাঁটাবন, ঢাকা-১২০৫। গ্রন্থস্বত্ব : লেখক। প্রচ্ছদ : উত্তম সেন। অলঙ্করণ : সৈয়দ এনায়েত হোসেন। বর্ণবিন্যাস : আবীর কম্পিউটার, বাংলাবাজার, ঢাকা। মুদ্রণে : মৌমিতা প্রেস, ২৫ প্যারীদাস রোড, ঢাকা-১১০০। প্রকাশকাল : প্রথম প্রকাশ জানুয়ারি ১৯৯৭, কলকাতা। জাতীয় সাহিত্য প্রকাশ প্রথম প্রকাশ ফেব্রুয়ারি ২০১৫।

মূল্য : ১৪০.০০ টাকা

AAMADER SUBHASCHANDRA by Dr. Pabitra Sarkar. Published By Kamolkanti Das. Jatiya Sahitya Prakash, Concord Emporiun Shoping Complex, 253-54 Elephant Road. Dhaka-1205, Bangladesh. Copyright : Author. Cover Design : Uttam Sen. Date of publication : Jatiya Shahitya Prakash First Published February 2015.

Price : Tk. 140.00, US $ 3.00

ISBN 984-70000-0177-1

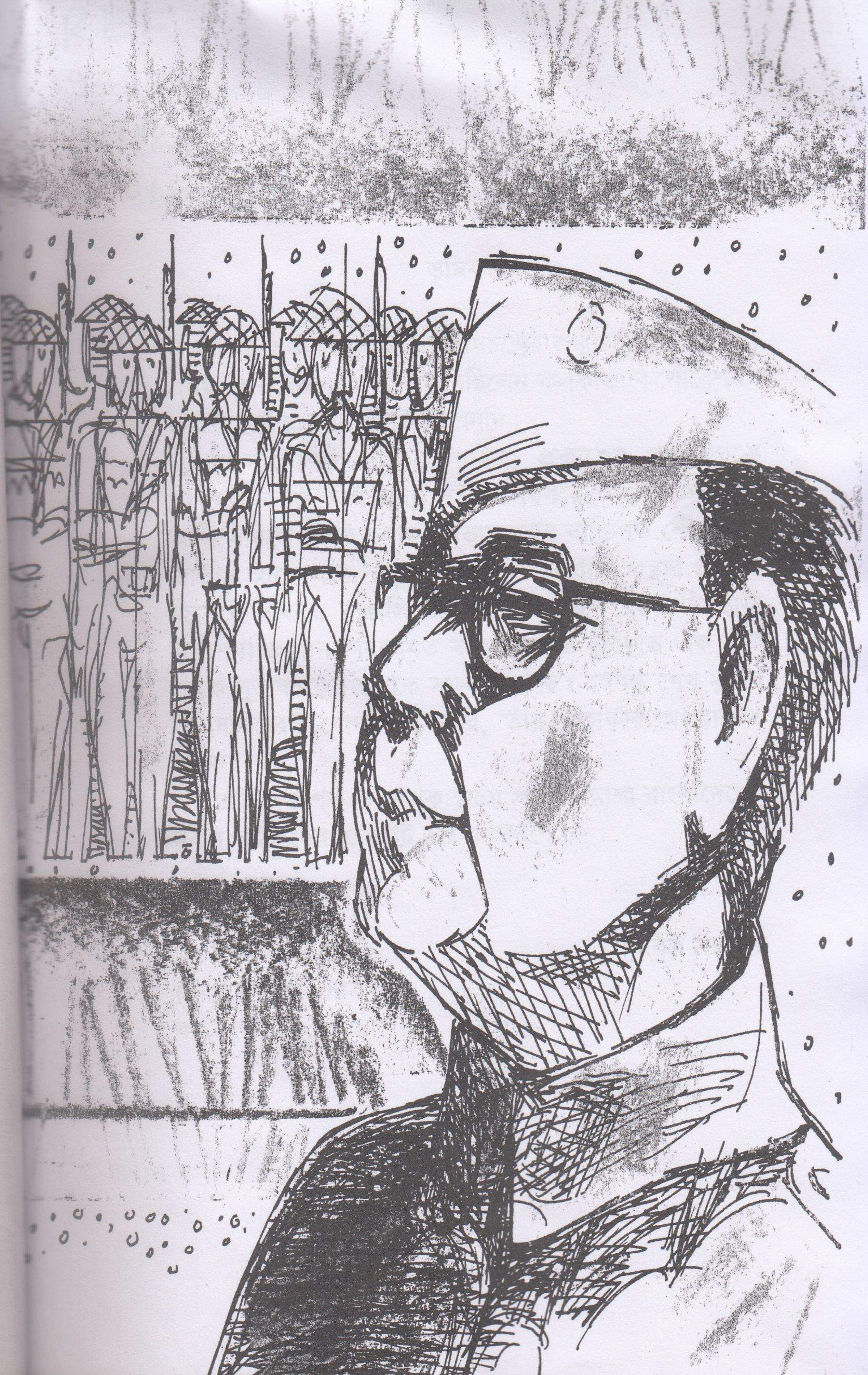

ভূমিকা

আমাদের সুভাষচন্দ্র বইটি সুভাষচন্দ্রের জন্মশতবর্ষে (১৯৯৭) প্রথম বেরিয়েছিল, প্রকাশ করেছিলেন কলকাতা কর্পোরেশন। তারপরে তাঁরা আর বইটি ছাপেননি।

বাংলাদেশের জাতীয় সাহিত্য প্রকাশের পক্ষ থেকে শ্রীকমল কান্তি দাস যখন বইটির বিষয়ে আগ্রহ দেখালেন আমি সানন্দে সম্মত হলাম। সুভাষচন্দ্রের ব্যক্তিগত শৌর্য এবং জাতীয় আন্দোলনে সম্পূর্ণ বিকল্প এক সংগ্রামী পন্থার প্রদর্শক হিসেবে এখনও বাঙালি কিশোর-কিশোরীর বুকে চিরস্থায়ী উদ্দীপনা জাগান। বিশেষত বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ এক দিক থেকে সুভাষচন্দ্রের স্বপ্নকে সফল করেছে। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব সুভাষচন্দ্রেরই যোগ্য উত্তরসূরি, তাঁর পতাকার অপরাজিত বাহক।

তাই প্রকাশক ও লেখক উভয় পক্ষের আশা বাংলাদেশের নবীন পাঠকদের এ বইটি ভালো লাগবে।

পবিত্র সরকার

২১ অক্টোবর ২০১১
(আজাদ হিন্দ দিবস)
কলকাতা ৭০০০৮৪

তোমরা কি জান একটা দেশের পরাধীনতা কথাটার মানে কী? স্বাধীনতা কাকে বলে?

তিনটে ঘটনার কথা বলি তা হলে।

একটা ঘটনা ঘটেছিল প্রায় দেড়শো বছর আগে। তখন আমাদের দেশের রাজা বিদেশি, ইংরেজ। ওই রাজার জাত ইংরেজরা পৃথিবীর বাজারে নীল বিক্রি করত। কাপড়ে দেওয়ার নীল রং। ওই নীল তখন একরকম গাছের রস থেকে পাওয়া যেত।

তারা জোর করে বাংলার চাষিদের দিয়ে ওই নীল চাষ করাত। চাষিদের পরিশ্রমের পয়সা দিত না; ধানের বা পাটের জমিতে নীল চাষ করাত বলে চাষির পেটের খাবারে টান পড়ত। ধান কম হলে খাবে কী? চাষি নীল চাষ করতে চাইত না। তখন তাকে ধরে নিয়ে গিয়ে তাকে শ্যামচাঁদ নামে চামড়ার চাবুক দিয়ে মারত, লাঠি দিয়ে শরীরের হাড় ভেঙে দিত। চাষির রক্তাক্ত শরীর গুদামঘরে চুনের গাদায় ফেলে দিত। গ্রামের যে সব লোক প্রতিবাদ করত তাদের বাড়িঘর জ্বালিয়ে দিত, মেয়েদের উপর অত্যাচার করত।

কত লোক ওই নীলকরদের হাতে মরেছে, কত মানুষের ভিটেবাড়ি মাটিতে মিশে গেছে, কত মেয়ে গলায় দড়ি দিয়ে মরেছে।

এমন যে ঘটেছিল, তার কারণ দেশ তখন পরাধীন, দেশের রাজা বিদেশি। সে কেবল নিজের লাভ দেখে, দেশের মানুষের ভালোমন্দ দেখে না।

কিংবা ধরো আজ থেকে পঁচাত্তর বছর আগে এক চৈত্র সংক্রান্তির দিনের কথা। বিনা বিচারে প্রজাদের ধরে ধরে জেলে ঠেলে দেবার আইন করেছে রাজা, অনেক নেতাকে জেলে পুরেও দিয়েছে। তারই প্রতিবাদ জানাতে পাঞ্জাবের অমৃতসর শহরের মস্ত পার্ক জালিয়ানওয়ালাবাগে

জমায়েত হয়েছে কয়েকহাজার মানুষ। একদিকে খাড়া ইংরেজ রাজার সৈন্যবাহিনী— হাতে রাইফেল। জনতা কিছু বুঝে ওঠবার আগেই গর্জে উঠল কয়েকশো রাইফেল। ব্যস, ওখানেই প্রাণ হারিয়ে লুটিয়ে পড়ল তিনশো ঊনআশি জন মানুষ, আহত হল দেড়হাজার।

এরই নাম পরাধীনতা। অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করো, বিদেশি রাজা তোমার বুক লক্ষ করে গুলি ছুঁড়বে, তোমার গলায় পরাবে ফাঁসির দড়ি। ক্ষুদিরাম থেকে আরম্ভ করে কত বিপ্লবী হাসতে হাসতে সেই ফাঁসির দড়ি গলায় পরেছেন। বিপ্লবী যতীন দাস চৌষট্টি দিন অনাহারে থেকে মৃত্যুকে ডেকে নিয়েছেন।

স্বাধীনতার জন্যই না এত ত্যাগ, এত যন্ত্রণা, এত মৃত্যু।

কিংবা ধরো আজ থেকে প্রায় সত্তর বছর আগে। বিদেশি ইংরেজ সরকার জার্মানি ইতালি আর জাপানের সঙ্গে যুদ্ধে জড়িয়ে পড়ল। আমরা ভারতের মানুষ, জার্মানি, ইতালি, জাপান আমাদের সঙ্গে শত্রুতা করতে আসেনি, সে যুদ্ধের সঙ্গে আমাদের কী সম্পর্ক? কিন্তু বাংলার মানুষের সারা বছরের খাবার চাল ইংরেজ তুলে নিয়ে গেল তার সৈন্যদের খাওয়াবে বলে।

গ্রামের মানুষ চালের অভাবে ঘাস-পাতা খেয়ে ক-দিন বাঁচল; তারপর কঙ্কালের মিছিলের মতো শহর কলকাতায় এল ভিক্ষে করতে, 'ফ্যান দাও, ফ্যান দাও' বলে চ্যাঁচাতে। তারপর রাস্তায় পড়ে পড়ে মরতে লাগল। এভাবেই ১৩৫০ সালের দুর্ভিক্ষে বাংলার তিন কোটি লোকের মধ্যে চল্লিশ লক্ষ লোক মরেই গেল। না খেতে পেয়ে। পথে ঘাটে জমে উঠল মরা মানুষের স্তূপ।

কেন এমন ঘটল? ঘটল তার কারণ দেশের রাজা ভিনদেশি, সে কেবল নিজের স্বার্থ দেখে, প্রজার দুঃখ দেখে না।

দেশের বহু লোক এসব মুখ বুজে সহ্য করেছে। কেউ কেউ রাজার চাকরি নিয়ে রাজাকে খুশি রেখে নিজের অবস্থা ভালো করল, বিষয়সম্পত্তি টাকাকড়ি বাড়িয়ে 'রায়সাহেব' 'রায়বাহাদুর' খেতাব পেল, সমাজের কেষ্টবিষ্টু হয়ে বসল। জমিদারি কিনল, রাজার হালে থাকতে লাগল।

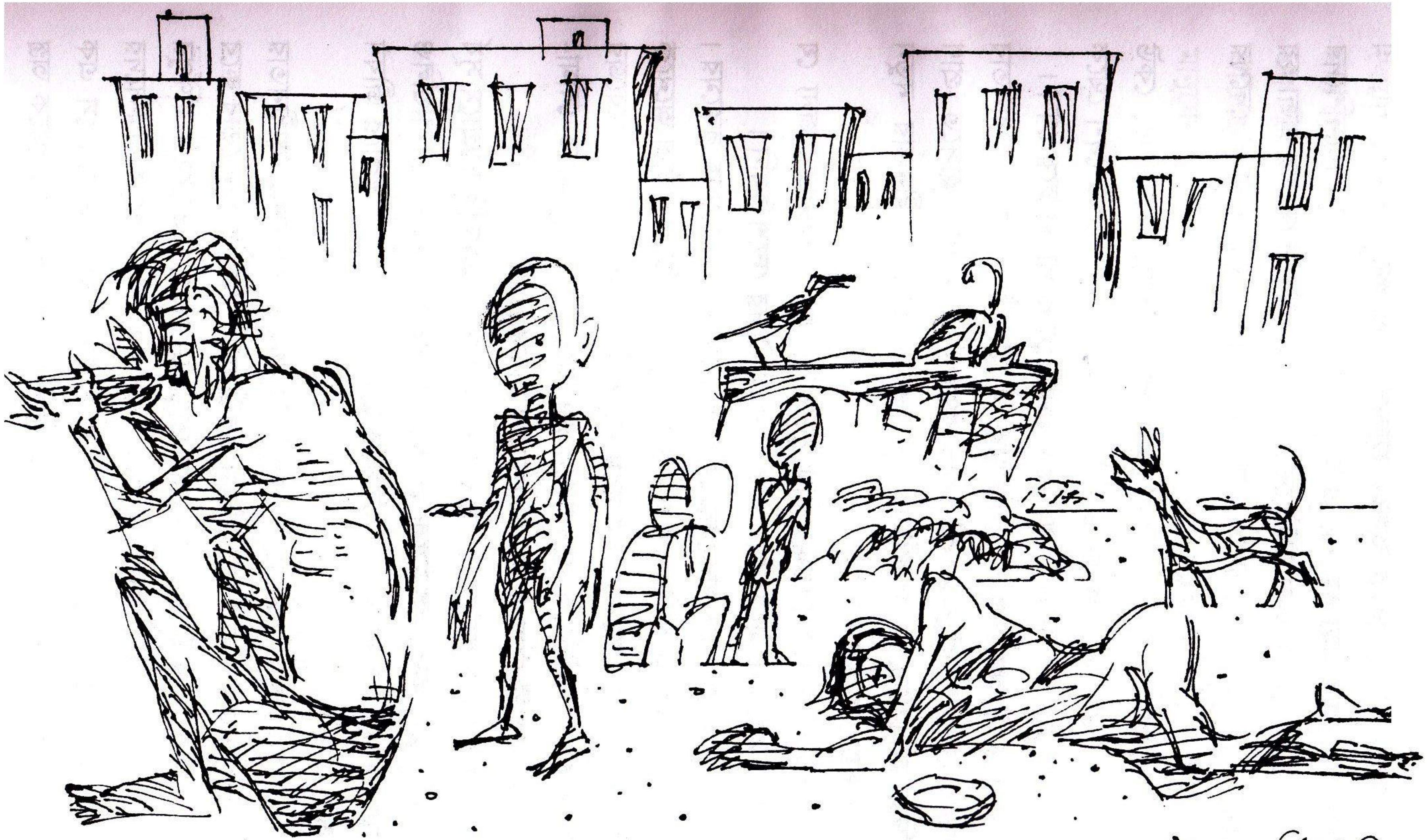

১৩৫০ সালের দুর্ভিক্ষে বাংলার তিন কোটি লোকের মধ্যে চল্লিশ লক্ষ লোক মরেই গেল

আবার কিছু লোক অসহ্য জ্বালায় জ্বলে পুড়ে ভাবল, না, এ অত্যাচার আর সহ্য হয় না, এ অবস্থা পালটাতেই হবে। বিদেশিদের দেশের বুক থেকে তাড়াতেই হবে। দেশের মানুষ যদি দেশের রাজা হয় তবেই দেশের মঙ্গল, দেশের মানুষের ভালো। কারণ তারা দেশের মানুষের কথা শুনে চলবে।

ইংরেজ মেরে তারা কেউ জেলে পচল বছরের পর বছর, কেউ পুলিশের গুলিতে মরল, কেউ ফাঁসির দড়িতে ঝুলল, কেউ দেশ থেকে বহু দূরে সমুদ্রের মধ্যে দ্বীপের জেলখানায় থেকে পাগল হয়ে গেল।

এঁদেরই আমরা বলি দেশপ্রেমিক বিপ্লবী। এঁরা দেশের স্বাধীনতার জন্য কোনো কষ্টকেই কষ্ট বলে মানেননি, হাসতে হাসতে প্রাণ দিয়েছেন। দেশের পরাধীনতা দূর করার জন্য, স্বাধীনতার নতুন সূর্যোদয় ডেকে আনার জন্য।

এই রকম এক বিপ্লবীর নাম সুভাষচন্দ্র বসু। স্বাধীনতার জন্য যে লড়াই, তার এত বড়ো সেনাপতি আর আমাদের দেশে হয়নি।

লড়াই তো কত রকমের হয়। প্রতিবাদও তো অনেক রকমের। আমাদের দেশের স্বাধীনতার লড়াইয়ে যাঁরা নেতা ছিলেন তাঁরা অনেকে সভা সমিতি করেছেন। গরম গরম বক্তৃতা দিয়েছেন, আবার ইংরেজের সঙ্গে চেয়ারে টেবিলে বসে আলোচনা করেছেন, কিন্তু হাতে বোমা-বন্দুক নিয়ে ইংরেজ মারতে ঝাঁপিয়ে পড়েননি।

কিছু দামাল ছেলেমেয়ে আবার তা-ই করেছে, এমনকি চট্টগ্রামে সূর্য সেন বা মাস্টারদার দল ইংরেজের অস্ত্রশালা ভেঙে রাইফেল গোলাগুলিও লুট করেছে। তাঁরা গুলিতে ফাঁসিতে মরেছে, জেলের অন্ধকারে জীবন কাটিয়েছে।

সুভাষচন্দ্রের যুদ্ধ ছিল সম্পূর্ণ আলাদা। এদেশের স্বাধীনতার ইতিহাসে তার তুলনা নেই। তিনি একটা গোটা সৈন্যবাহিনী তৈরি করে বার্মার পথ ধরে ইংরেজ সৈন্যদের তাড়াতে তাড়াতে ভারতের মণিপুর পর্যন্ত এসে পৌঁছেছিলেন। এ যেন রূপকথার এক রাজপুত্র রাক্ষসদের বধ করবার জন্য ঘোড়া ছুটিয়ে এল তলোয়ার হাতে নিয়ে। সে এক আশ্চর্য কাহিনি, অবিশ্বাস্য গল্প। ইংরেজ যে বাঙালির হাত থেকে অস্ত্র

কেড়ে নিয়েছিল, যে বাঙালিকে সবাই অসহায় দুর্বল বলে ভাবত, তারই মধ্য থেকে উঠে এসেছিল অসংখ্য বিপ্লবী, আর সুভাষচন্দ্রের মতো দুর্জয় এক বীর। যিনি বলেছিলেন, ফুসফুসের জন্য যেমন দরকার বাতাসের অক্সিজেন, তেমনই মানুষের প্রাণের জন্য দরকার স্বাধীনতা। জীবন্ত মানুষের কাছে আসল অমৃতের মতো এই স্বাধীনতা।

দুই

অথচ তাঁর কিন্তু এরকম হওয়ার কথা ছিল না। সুভাষের বাবা দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার কোদালিয়া গ্রামের সন্তান জানকীনাথ বসু ছিলেন ওড়িশার কটক শহরের নামজাদা সরকারি উকিল। সরকারি সব মামলার দেখাশোনার দায়িত্বও পেয়েছিলেন, এমনকি কটক শহরের পুরসভার সভাপতি হয়েছিলেন ১৯১২ সালে। রাজভক্ত প্রজা হিসেবে পেয়েছিলেন 'রায়বাহাদুর' উপাধি। তাঁরই ছেলে তো সুভাষচন্দ্র। কটকের ওড়িয়া বাজার এলাকায় জানকীনাথের বিশাল বাড়ি। মস্ত উঠোনের তিন দিকে সারি সারি ঘর। এখন যদি তোমরা সে বাড়িতে যাও, এলাকার মুসলমান প্রতিবেশীরা তোমাকে দেখাবেন কোন্ ঘরে সুভাষ জন্মেছিলেন, ১৮৯৭ সালের ২৩শে জানুয়ারি তারিখে। দক্ষিণমুখী সেই ঘরে জিনিস বলতে আছে একটা দেয়ালে গাঁথা কাঠের আলমারি, আর একটা লোহার খাট। বারান্দায় ওঠার পাথরের সিঁড়ি দেখিয়ে তাঁরা বলবেন, এখানেই হাঁটি-হাঁটি পা-পা করতে গিয়ে কতবার আছাড় খেয়েছে শিশু সুভাষ। পাশের একটা ঘর ভর্তি আছে বহু পুরোনো ভাঙাচোরা সব খেলনা দিয়ে। সে সব দিয়ে নাকি শিশু সুভাষ খেলা করেছে। রাখা আছে সেই চরকাটি, যাতে সুভাষ প্রথম সুতো কাটতে আরম্ভ করেছিলেন। এখন সুভাষের স্মৃতি নিয়ে বেঁচে আছে এই মস্ত পুরোনো বাড়ি।

যে কথা বলছিলাম। সুভাষ যে দেশকে ভালোবেসে দেশের স্বাধীনতার জন্য নিজের প্রাণ দেবেন, সে কথা তাঁর ছেলেবেলা দেখে কেউ ভাবতে পারেনি। বাবা মস্ত বড়োলোক, তার উপরে রাজার কর্মচারী, 'রায়বাহাদুর'। জানকীনাথ আর তার স্ত্রী প্রভাবতী দেবীর চোদ্দটি ছেলেমেয়ে, সুভাষ তার মধ্যে নয় নম্বর। মেজদাদা শরৎচন্দ্র বসু

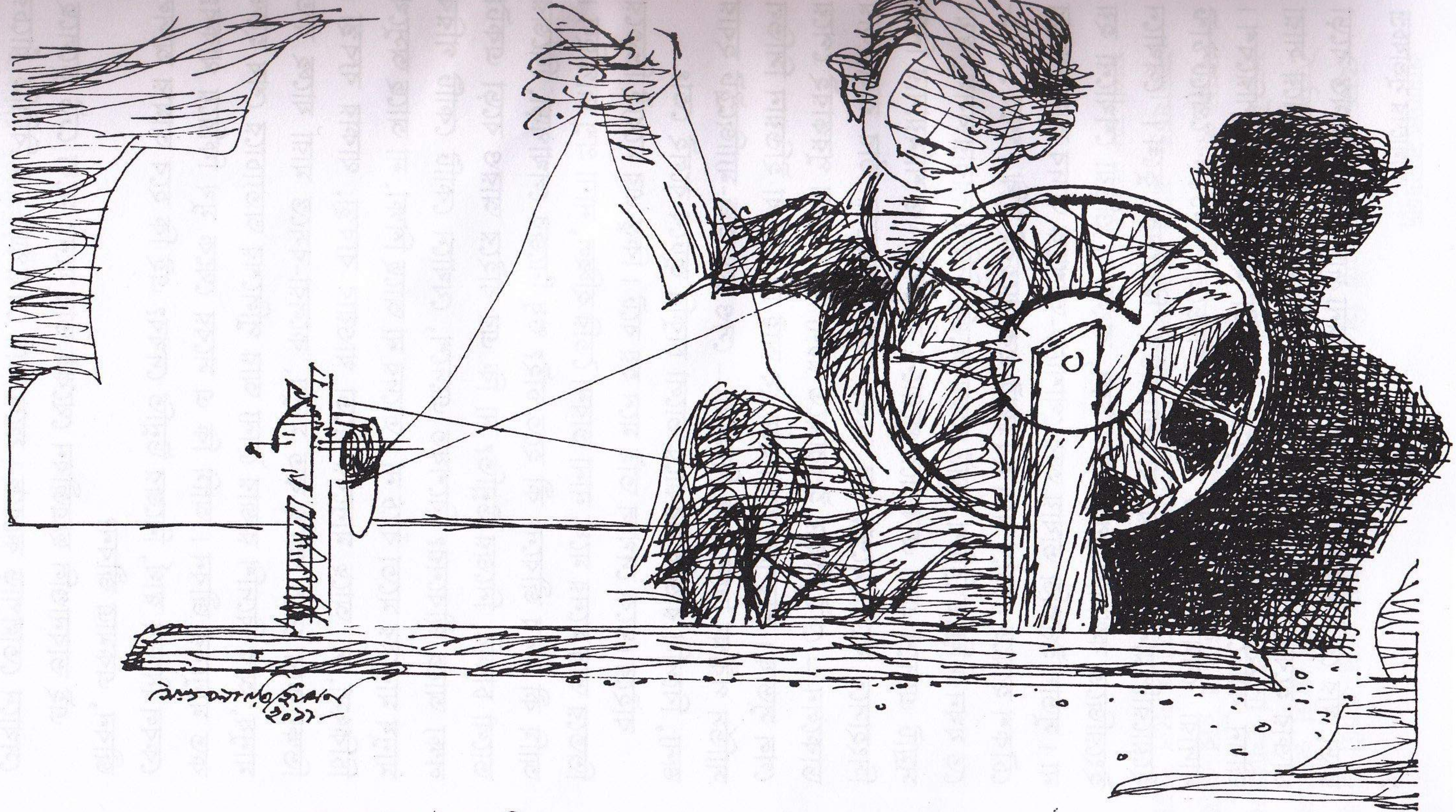

রাখা আছে সেই চরকাটি, যাতে সুভাষ প্রথম সুতো কাটতে আরম্ভ করেছিলেন

ছাড়া আর কেউ রাজনীতি করবেন না। অন্য দাদাদের কেউ মস্ত বড়ো ডাক্তার হবেন, কেউ বিদেশেই (ইংল্যান্ডে) মস্ত বড়ো কাজ নিয়ে সারা জীবন কাটিয়ে দেবেন। বাড়িতে খানিকটা ইংরেজ-ঘেঁষা পরিবেশ। দাদারা যেমন, সুভাষও তেমনই পড়েছেন কটকে প্রোটেস্টান্ট ইয়োরোপিয়ান মিশনের বা ব্যাপটিস্ট মিশনের স্কুলে। সেখানে ইংরেজিতে কথাবার্তা পড়াশোনা চলে, বাংলা বা ওড়িয়া শেখানো হয় না। সুভাষ ইংরেজি ভাষায় আর পোশাকে-আশাকে আদব কায়দায় খুব চৌকশ হয়েছে। দেখে মনে হয় ছোট্ট এক সাহেবই বুঝি। পরে ১৯১১-তে যখন দিল্লিতে ব্রিটিশ সম্রাট পঞ্চম জর্জের দিল্লির দরবার বসল, স্বয়ং সম্রাট এদেশে এসে একেবারে পুরোনো কায়দায় মস্ত শামিয়ানার নিচে সিংহাসনে বসে দেশের সব বড়ো বড়ো লোকদের তাঁর রাজসভায় ডাকলেন— সেই বিষয়ে ইংরেজিতে রচনা লিখে প্রথম পুরস্কারই পেয়ে গেল সুভাষ। তারপরে বড়ো হয়ে যে আই সি এস বা ইন্ডিয়ান সিভিল সার্ভিস পরীক্ষা দিতে গেল বিলেতে— সেও তো জজ-ম্যাজিস্ট্রেট হবার জন্য, বিদেশি রাজার সরকারে ভালো চাকুরি জুটবে বলেই তো?

বাইরে থেকে দেখলে তাই মনে হয় বটে। কিন্তু এর মধ্যেই ভিতরে ভিতরে তার মনের মধ্যে নানা ভাবনা তৈরি হচ্ছিল, নানা প্রশ্ন জাগছিল। আমি কী করব জীবনে? কী হতে চাই? শুধু নিজের লেখাপড়া, নিজের ভালো চাকরি, নিজের উন্নতি? না কি এর বাইরে আরও বড়ো একটা লক্ষ্য আছে জীবনের? বিশেষত এদেশে, যেখানে কোটি কোটি গরিব মানুষ মানুষের মতো বাঁচে না। তাদের না আছে শিক্ষা, না আছে অসুখে চিকিৎসা, না আছে মানুষের মতো খাওয়ার ব্যবস্থা, থাকার ব্যবস্থা। ভিক্ষা করে বেঁচে আছে কত মানুষ, কলেরা-বসন্তে মারা যাচ্ছে কত মানুষ, আর বিদেশি রাজার সৈন্য আর পুলিশের অত্যাচারে শেষ হচ্ছে কত মানুষের জীবন। আমি কি এ সবের থেকে মুখ ফিরিয়ে থাকব? কেবল নিজের স্বার্থ, নিজের উন্নতি দেখব? এই কি হবে আমার আসল জীবন, একমাত্র জীবন?

এই ভাবনাগুলি ছাত্রজীবন থেকেই তার মনের মধ্যে ঢেউ তুলেছে, সেখানে তোলপাড় করেছে। ফলে তার লেখাপড়া যত বিলিতি ধাঁচের

হোক, দিক সে আই সি এস পরীক্ষা, কিন্তু তার আর-একটা জীবন তৈরি হচ্ছিল পাশাপাশি। সারা ছাত্রজীবন জুড়ে এই দুটো জীবনের লড়াই চলেছে তার মধ্যে, তারপর একটা জীবন শুকনো খোলসের মতো খসে পড়েছে। বেরিয়ে এসেছে দেশের স্বাধীনতার বীর যোদ্ধা সুভাষচন্দ্র, যাকে এক সময় সারা দেশের মানুষ নেতাজি বলে শ্রদ্ধায় মাথা নত করবে।

তিন

বিশাল বাড়ি জানকীনাথের, তাতে শুধু জানকীনাথ, তাঁর স্ত্রী প্রভাবতী আর তাঁদের ছেলেমেয়েরা নয়, আছে অনেক মানুষজন। কর্মচারী, কাজের লোক; শুধু তাই নয়, বাড়িতে থেকে কাজকর্ম করছে এমন বহু লোক— তখন কলকাতা থেকে বাঙালিরা এলে অনেকেই 'জানকীনাথ সাহেব'-এর বাড়িতে উঠত। সে বাড়ির দরজা ছিল সকলের জন্য খোলা। সেই সঙ্গে ছিল অনেক পোষা প্রাণী— গোরু, বাছুর, ছাগল, এমনকি ময়ূর পর্যন্ত।

এই মস্ত ভিড়ে ভর্তি বাড়িতে যখন জন্ম হয়েছিল সুভাষের, তা নিয়ে তেমন কিছু হইচই হবার কথা নয়। আগেই বলেছি, সুভাষ ছিল জানকীনাথ আর প্রভাবতীর চৌদ্দটি সন্তানের মধ্যে নবম। নানা কাজে ব্যস্ত বাবা ছিলেন গুরুগম্ভীর, দূরের মানুষ। বয়সেও প্রায় সাঁইত্রিশ বছরের তফাত বাবা আর ছেলের। মা প্রভাবতী যদিও কিছু কাছের মানুষ, তবু এত বড়ো সংসারের দেখাশোনা করেন, সকলের থাকা খাওয়ার দিকে নজর দিতেই তাঁর দিক কেটে যায়। সুভাষ বড়ো একলা, নিঃসঙ্গ। তার দেখাশোনা করে সারদা নামে এক দাসী, যে সুভাষকে মায়ের মতোই ভালোবাসে, তাকে 'রাজা' বলে ডাকে। তবু সুভাষের মনে হয় এত বড়ো বাড়িতে তার সঙ্গী কেউ নেই। তাই সে অনেকক্ষণ চুপচাপ থাকে, নিজের মনে খেলা করে, আর আকাশ-পাতাল ভাবে।

পড়াশোনা অবশ্য সে মন দিয়েই করছে। প্রোটেস্ট্যান্ট ইয়োরোপিয়ান স্কুলে সে খুব ভালো ইংরেজি শিখেছে, লিখতে-পড়তে দুইই বেশ ভালো পারে। হবে না কেন? খাস ইংরেজের ছেলেরাও তো পড়ে এই স্কুলে। তবে বিলেতের স্কুলের মতোই এখানে খেলাধুলো করতে হয় খুব, সেটা সুভাষ ঠিক পেরে ওঠে না। ছেলেবেলা থেকেই তার চোখ খারাপ, আর শরীরও খুব শক্তসমর্থ নয়। ফলে তার ইংরেজ

আর অ্যাংলো-ইন্ডিয়ান বন্ধুরা ঠাট্টা-তামাশা করে। আর তার বাড়িতে সে বাংলায় কথা বলে, মার কাছে রামায়ণ-মহাভারত শোনে, বাবা প্রতি বছর দেশে গ্রাম কোদালিয়ায় গিয়ে দুর্গাপূজা করেন, গ্রামে গরিব মানুষদের কাপড়চোপড় দেন। কিন্তু ইশকুলে সেসব কোথায়? এখানে শুধু ইংরেজি বলা, ইংরেজিতে পড়াশোনা, নানা কায়দাকানুন আর দৌড়ঝাঁপ। সুভাষ যেন হাঁপিয়ে ওঠে। বাড়িতে তার একটা জীবন, ইশকুলে আর-একটা।

তার বারো বছর বয়সে সেই স্কুল ছেড়ে সে ভর্তি হল কটকের বিখ্যাত র‍্যাভেনশ' কলেজিয়েট স্কুলে। সুভাষ যেন নিশ্বাস ছেড়ে বাঁচল। এখানেই সে সাহেবি কোটপ্যান্ট ছেড়ে বাঙালির ধুতি জামা পরে আসতে শুরু করল। এখানে বাংলাও সে পড়তে পারবে। খুব একটা খেলাধুলা করতে হবে না। লেখাপড়াটা আরও মন দিয়ে করবে। আগের স্কুলেই সুভাষ লেখাপড়ায় ক্লাসে সকলের উপরে থাকত। এই স্কুলে এসে ফর্সা, লম্বা, চশমাচোখে ঝকঝকে এই ছেলেটি যেমন শিক্ষকদের মন জয় করে নিল, তেমনই সহপাঠীরাও তার ভক্ত হয়ে পড়ল। শুধু যে প্রথম পরীক্ষাতেই বাংলায় সবচেয়ে বেশি নম্বর পেল তাই নয়। শোনা যায়, এক ক্লাসের পরীক্ষায় সংস্কৃতের পণ্ডিতমশায় সুভাষকে একশোতে একশো নম্বরই দিয়ে রেখেছিলেন। যখন হেডমাস্টার মশাই অবাক হয়ে তাকে জিজ্ঞেস করলেন, 'একেবারে একশোতে একশোই দিলেন?' পণ্ডিতমশাই নাকি জবাব দেন, 'দিতে হল, কারণ একশোতে একশো-দশ তো আর আপনি দিতে দেবেন না আমাকে।' এ হয়তো বানানো গল্প। যাদের গুণে আমরা মুগ্ধ থাকি তাঁদের সম্বন্ধে অনেক সময় এরকম গালগল্প ছড়াই। ছড়াই এই কারণে যে, তাঁদের সম্বন্ধে এসব কথা আমাদের বিশ্বাস করতে ইচ্ছে হয়।

লেখাপড়ায় কিশোর সুভাষ অসাধারণ ছিল। আমরা পরে দেখব স্কুল কলেজের পরীক্ষাতেও তার প্রমাণ সে রেখেছে। কিন্তু সুভাষ তো সেইজন্য সুভাষ নয়। লেখাপড়ায় ভালো ছেলে তো সারা দেশে হাজার হাজার হয়। সুভাষ কি শুধু তাই? ভালো ছেলের চেয়ে বেশি কিছু, অনেক দামি কিছু তার মধ্যে ছিল, তাই-না সে হয়ে উঠল সুভাষচন্দ্র, নেতাজি।

মার কাছে রামায়ণ-মহাভারত শোনে

সে জিনিসটা কী, যা তাকে অন্য 'ভালো ছেলেদের' থেকে আলাদা করে এনেছিল? সে হল এক অশান্ত অস্থিরতা। যেন সে সব সময় একটা বড়ো কিছু খুঁজছে, খুঁজে না পেলে যেন তার স্বস্তি নেই, মুক্তি নেই। রাত দিন ছটফট করত সুভাষ নিজের ভিতরকার এই অস্থিরতায়।

এই স্কুলে তার সব ভালোবাসা আর শ্রদ্ধা কেড়ে নিলেন হেডমাস্টারমশাই, বেণীমাধব দাস। পরম স্নেহে কাছে টেনে নিলেন এই উজ্জ্বল ছাত্রটিকে। সুভাষ এমনিতেই গাছপালা খুব ভালোবাসত, বাগানে গাছপালায় জল দেওয়া যত্ন করা ছিল তার ছেলেবেলা থেকেই খুব প্রিয় কাজ। বেণীমাধব সেটা জানতেন। তাই তার মনে অস্থিরতা দেখে বললেন, 'যাও, নদীর ধারে গিয়ে নদীর শোভা দ্যাখো, পাহাড়ে গিয়ে সূর্যাস্তের সৌন্দর্য দ্যাখো। দ্যাখো পৃথিবী কত সুন্দর! সুন্দরের ধ্যান করো, জীবনকে সুন্দর করে তৈরি করো।' বেণীমাধব তাকে পড়তে বলেছিলেন রামায়ণ মহাভারত। নদীর ধারে বেড়াতে বেড়াতে সুভাষ সংস্কৃত আর ইংরেজি থেকে কত কবিতা আবৃত্তি করেছে, কত দেশি-বিদেশি বই পড়েছে। বইয়ের নেশা তো শিশুকাল থেকেই। বই পেলে আর কিছু তার চাই না। আশ্চর্য ছিল তার স্মৃতিশক্তি। কোনো পড়া দু-বার শুনলেই তার মুখস্থ হয়ে যেত।

এই সময়েই, সুভাষের যখন পনেরো বছর বয়স, তখন স্বামী বিবেকানন্দের রচনাবলি তার হাতে পড়ল। আর বিবেকানন্দের লেখা যেন তার শরীরে বিদ্যুৎ ছুঁইয়ে দিল। মস্ত এক ঝাঁকুনি দিয়ে তার মুখ ফেরাল দেশের দিকে, দেশের গরিব অসহায় মানুষগুলির দিকে। কী অসম্ভব কষ্টে বাঁচে তারা। বাড়িতে ভিখারি আসত দলে দলে। ছেলেবেলা থেকেই বালক সুভাষের কাজ ছিল তাদের ভিক্ষে দেওয়া। কিন্তু কজনকে সে ভিক্ষে দেবে। সারা দেশের কোটি কোটি মানুষ যেখানে গরিব, ভিক্ষে দিয়ে কি তাদের গরিবানা দূর করা যায়? বিবেকানন্দের জ্বলন্ত বাণী বুকে নিয়ে স্কুলের বন্ধুদের নিয়ে তৈরি করল এক 'স্বেচ্ছাসেবা সঙ্ঘ'। মড়া পোড়ানোর লোক পাওয়া যাচ্ছে না তো কী, সুভাষের দল তো আছে! কটকে তখন গরিবদের বস্তিতে কলেরা আর বসন্ত রোগ লেগেই থাকত। সুভাষের দলবল বেরিয়ে পড়ত

কলেরা আর বসন্ত হওয়া রোগীদের সেবা করতে। তাদের মনে না ছিল ঘৃণা, না ছিল ভয়। ওই নোংরা পরিবেশে বমি আর নোংরায় মাখা রোগীদের তারা অতি যত্নে পরিষ্কার করে তাদের সেবা করত, ওষুধপত্র দিত, বসন্ত রোগীদের শরীরের পুঁজরক্ত মুছিয়ে তাদের গায়ে ওষুধ লাগিয়ে দিত। এমনও কখনও হয়েছে যে, কটকের আশেপাশের গ্রামের লোকে তাদের ঘরে ঢুকতেই দেয়নি। তারা বড়োলোকের ছেলে, তারা কেন একাজ করতে এসেছে? অনেক কষ্টে সুভাষ তাদের বোঝাতে পেরেছিল যে, এক কাজের পিছনে তাদের কোনো স্বার্থ নেই।

প্রতি রবিবার তারা ঘর থেকে চাল জোগাড় করে গরিব ছাত্রদের হস্টেলে দিয়ে আসত। একবার র‍্যাভেনশ কলেজের হস্টেলে নিউমোনিয়া হল একটি সাঁওতাল ছেলের, নাম তার মঙ্গল মাঝি। সে তো গরিব আদিবাসী, তথাকথিত ভদ্রলোক নয়। তাই তার হস্টেলের সঙ্গীরা তার কাছেই ঘেঁষল না, কেউ তার সেবা করতে এগিয়ে এল না।

কী করে সুভাষের মা প্রভাবতী খবর পেলেন, ছেলেটি হস্টেলে একা কিনা চিকিৎসায় বিনা যত্নে মারা যেতে বসেছে। অমনি ছুটে চলে গেলেন হস্টেলে, তার মাথা কোলে তুলে নিয়ে অত্যন্ত স্নেহে তার সেবা করতে লাগলেন। খবর পেয়ে সুভাষ চলে এল, বলল, মা তুমি যাও, আমরা এর সেবার ভার নিচ্ছি।

এই স্কুলে পড়ার সময়ই এক বিপ্লবী বন্ধু জুটল সুভাষের, তার নাম হেমন্তকুমার সরকার। সেই সঙ্গে একটু ধ্যানট্যান করার দিকেও তার ঝোঁক হল যেন। বাবা মা একটু ভাবনায় পড়লেন, এই বয়সে ধর্মকর্মের দিকে ছেলের এত ঝোঁক কেন? মধ্যে মধ্যে দেশের কথাও সে ভাবে, ভাবে দেশের দুরবস্থার কথা। কিন্তু ইংরেজ তাড়িয়ে দেশ স্বাধীন করার স্বপ্ন এখনও তার মনে জাগেনি। মনের মধ্যে এখনও অস্থিরতা। প্রায়ই সে বন্ধুদের সঙ্গে বেরিয়ে যায়, অনেক দেরি করে বাড়ি ফেরে। মা-বাবা চিন্তায় পড়েন, সাবধান করেন। কখনও বকুনি দেন। মার চোখের জলও সুভাষকে বাঁধতে পারে না। তাঁর মনে হয় বাড়িতে শাসনের বড়ো কড়াকড়ি, বড়ো বেশি বাঁধাবাঁধি। বাবা-মা প্রায় হতাশ হয়ে পড়ছিলেন সুভাষ সম্বন্ধে।

এমন সময় ১৯১২ সাল এল। সুভাষ কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ম্যাট্রিকুলেশন (তখনকার মাধ্যমিক) পরীক্ষায় বসলেন। আর, কী আশ্চর্য, সমস্ত ছেলেমেয়ের মধ্যে দ্বিতীয় হলেন। ব্যস্। বাউন্ডুলে ছেলের এমন অসাধারণ ফলে দেখে বাবা-মার চিন্তা এক মুহূর্তে দূর হল। তাঁরা ভাবলেন, চমৎকার হল! এবার, সুভাষকে কলেজে পড়তে কলকাতায় পাঠিয়ে দিচ্ছি— তার ধর্মের বাই দূর হবে। মনের ছটফটানিও এবার পালাবে। কলকাতা শহরের নানা হইচই উত্তেজনার মধ্যে তার ওসব করার সময়ই থাকবে না।

প্রেসিডেন্সি কলেজের আই.এ. ক্লাসে ভর্তি হল সুভাষ। হেমন্তকুমার সরকারের সূত্রে কলকাতার বিপ্লবী এক ছাত্রদলের সঙ্গে তার যোগাযোগ হয়েছে, কিন্তু এখনও বিপ্লবের ডাকে সে তেমন সাড়া দিতে তৈরি নয়। ধর্মই এখনও তার মনকে দখল করে আছে। রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের সঙ্গে সঙ্গে অরবিন্দের রচনাবলিও সে মন দিয়ে পড়ছে। তার কখনও মনে হচ্ছে, দূর, কী হবে পড়াশোনা করে? তার চেয়ে হিমালয়ের দূর গুহায় সন্ন্যাসী হয়ে গিয়ে বাস করি, গুরুর কাছে দীক্ষা নিই। এইরকম ভাবতে ভাবতে কাউকে কিছু না বলে ১৯১৪-র গ্রীষ্মের ছুটিতে হুট করে সে চলেই গেল। সঙ্গী বন্ধু হেমন্ত। তারা ঘুরে বেড়াল হরিদ্বার, হৃষিকেশ, লছমনঝোলা, মথুরা, বৃন্দাবন, কাশী, গয়া— আরও কত জায়গা। সাধু-সন্ন্যাসীদের খুব কাছে থেকে দেখল সুভাষ, তেমন মনে ধরল না কাউকেই। গুরুর দেখা পেল না সে এ যাত্রা। কাশী থেকে ফিরে এল কলকাতায়। এসেই টাইফয়েড জ্বরে শয্যাশায়ী হয়ে পড়ল।

এইসব বাধাবিঘ্নের পর পরের বছর সে যখন আই-এ পরীক্ষা দিল, তখন প্রথম বিভাগ পেল বটে, কিন্তু ম্যাট্রিকুলেশনের তুলনায় এ ফল বেশ খারাপ। যতটা সবাই আশা করেছিল তার কিছুই না। যাই হোক, প্রেসিডেন্সি কলেজেই দর্শন নিয়ে বি এ পড়বে বলে আবার সেখানে ভর্তি হল সে।

চার

ধর্মের নেশাটা এবার বোধ হয় একটু কমে এসেছে। আই এ পরীক্ষার ফল তার মনের মতো হয়নি, তাই সে আবার ভালো ছেলে হতে চাইছে, মন দিয়ে পড়শোনা শুরু করেছে। এমন সময় কলেজে এমন দুটো-একটা ঘটনা ঘটল যাতে তার জীবনটাই পালটে যাবার একটা নিশানা তৈরি হল।

প্রথম ঘটনাটা ঘটেছিল ১৯১৬ সালের ১০ জানুয়ারি। সুভাষ তখন বি এ ক্লাসের ছাত্র। ইতিহাসের ইংরেজ অধ্যাপক এডোয়ার্ড ফারলি ওটেন ইতিহাস পড়াচ্ছিলেন ক্লাসে, এমন সময় বাইরের বারান্দায় আওয়াজ শুনে তিনি বিরক্ত হয়ে বেরিয়ে এলেন, দেখলেন বারান্দায় কয়েকটি ছেলে জটলা করছে। সে ছাত্রদের একচোট বকুনি দিলেন। শোনা যায়, ক্লাসে ফিরে এসে বাঙালিদের বা ভারতীয়দের জাত তুলে গালাগালও দিয়েছিলেন ওটেন। তখন ক্লাসের প্রতিনিধি সুভাষ উঠে দাঁড়িয়ে ওটেনের এই আচরণের তীব্র প্রতিবাদ করলেন। প্রিন্সিপাল হেনরি জেম্‌সকে গিয়ে অভিযোগ করলেন বাঙালি ছাত্রদের সঙ্গে ওটেনের দুর্ব্যবহার নিয়ে।

জেম্‌স বললেন, কী এমন ব্যাপার—জিনিসটা তোমরা মিটিয়ে নাও না।

কিন্তু ব্যাপারটা অত সহজে মিটল না। এর মধ্যে সারা কলকাতায় ছড়িয়ে গেছে ওটেনের গালাগালের কথা, ট্রামে ট্রেনে নাকি এই নিয়ে ইংরেজদের সঙ্গে বাঙালিদের হাতাহাতি শুরু হয়েছে। ছাত্ররা কলেজে ধর্মঘট ডাকল। তারপর ওটেন একবার ছাত্রদের সঙ্গে বৈঠকে বসলেন বটে। কিন্তু তাতে কোনো ফল হল না। পুরো কলেজ থমথমে, যেন কিছু একটা ঘটতে যাচ্ছে।

ক্লাসের প্রতিনিধি সুভাষ উঠে দাঁড়িয়ে ওটেনের এই আচরণের তীব্র প্রতিবাদ করলেন

শেষে ১৫ ফেব্রুয়ারি ঘটল সেই ঘটনা। আবার ওটেন পড়াচ্ছেন ক্লাসে, বারান্দায় সেই আওয়াজ শুরু হল। এবারে নিশ্চয়ই ইচ্ছে করেই ছাত্ররা সেটা করছিল। এবার আর মাথা ঠিক রাখতে পারলেন না ওটেন। ক্লাস থেকে ছুটে বেরিয়ে গিয়ে একটি ছাত্রের দুই গালে দুই থাপ্পড় কষিয়ে দিলেন, আর তাকে বিশ্রী গালাগাল দিলেন অসভ্যতার জন্য।

সেইদিন বিকেলে একতলার বারান্দায় ওটেন যখন ক্রিকেট খেলার নোটিশ লাগাচ্ছিলেন তখন কিছু ছেলে তাঁকে ঘিরে দাঁড়াল। ঠিক কী হল জানা যায় না। সরকারি তদন্ত কমিটি বলেছিল, ওটেনকে খুব মারধোর করা হয়েছে। পরে ওটেন আত্মজীবনীতে লেখেন, সে সব কিছুই না, ধাক্কাধাক্কিতে পড়ে গিয়ে তাঁর গায়ের দু এক জায়গায় ছড়ে গিয়েছিল মাত্র। যেটা মনে রাখবার মতো ঘটনা তা হল, ওটেন শুধু যে সুভাষকে এই ঘটনার জন্য ক্ষমা করেছিলেন তা নয়, পরে তাঁর এই মৃত্যুঞ্জয় ছাত্রের উদ্দেশ্যে ইংরেজিতে একটি কবিতাও রচনা করেছিলেন।

এই ঘটনায় সুভাষচন্দ্রের ভূমিকা কী ছিল, কতটা ছিল? আত্মজীবনীতে তিনি বলেছেন, তিনি ব্যাপারটা চোখে দেখেছেন মাত্র, অধ্যাপকের গায়ে হাত তোলেননি। কিন্তু ভাইপো অমিয়নাথ বসু পরে যখন তাঁকে এ বিষয়ে সোজাসুজি জিজ্ঞেস করেন তখন নাকি তিনি এমন হাসি হেসেছিলেন যা থেকে দুরকমই বোঝা যায়। যাই হোক, এ ঘটনার ছকটা সম্ভবত তিনিই করেছিলেন। এই কারণে প্রিন্সিপাল তাঁকে প্রথমেই সাস্‌পেন্ড করলেন, তাঁর কলেজে আসা বন্ধ হল। প্রিন্সিপালের আরদালি বংশীলাল সাক্ষী দিয়েছিল, সে সুভাষকে ওই মারামারিতে দেখেছে। তারপরে বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি কমিটি বলল, কোনো কলেজেই আর সুভাষ ভর্তি হতে পারবেন না। শেষে ভাইস চ্যান্সেলার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের কাছে অনুনয়-বিনয় করার পর তিনি তাঁকে স্কটিশ চার্চ কলেজে ভর্তি হওয়ার অনুমতি দিলেন। এই শাস্তিতে পড়াশোনার একটা বছর নষ্ট হল সুভাষের।

পড়াশোনায় সুভাষ চিরকালই ভালো, সেটা সবাই জানে। তা ছাড়া তাঁর মধ্যে নেতৃত্বের একটা সহজ ক্ষমতা ছোটো বয়স থেকেই লক্ষ

করা গেছে। র‍্যাভেনশ' কলেজিয়েট স্কুলে এই লম্বা ফর্সা সুন্দর ছেলেটিকে শুধু তার সহপাঠীরা নয়, বয়সে যারা বড়ো তারাও নেতা বলে মেনে নিয়েছিল। কিন্তু সে তো একটা ছোটো শহরের স্কুলে। তার ক্ষমতার কথা দেশের ক-জন লোকই বা জানত?

প্রেসিডেন্সি কলেজের ঘটনায় সুভাষের নাম দেশের লোকের কাছে ছড়িয়ে পড়ল। এবারে সুভাষ বুঝলেন, ঠিকমতো পরিকল্পনা করে অনেককে দিয়ে একটা কাজ করিয়ে নেবার ক্ষমতা তাঁর আছে। তিনি এসে দাঁড়ালেই সকলে তাঁর কথা মানবার জন্য তৈরি হয়ে থাকে। তবু সেই সময়ে সুভাষ ভাবলেন, আমাকে আরও তৈরি হতে হবে। শাস্তি তো যথেষ্ট হল, আর-একটু হলে লেখাপড়াই বন্ধ হতে বসেছিল। এবার একটু মন দিয়ে করি পড়াশোনা। এর মধ্যে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের আঞ্চলিক বাহিনীর স্বেচ্ছাসেবক হয়ে খানিকটা সৈনিকের ট্রেনিংও নিয়ে নিলেন। তখন কি তিনি জানতেন, পঁচিশ বছর পরে এই সৈনিকের জীবনই তাঁকে বেছে নিতে হবে? বোধ হয় না। নিজেকে তিনি নানাভাবে তৈরি করে তুলছেন। হেমন্তকুমার সরকারের সূত্রে বিপ্লবী দলের সঙ্গে যোগাযোগ হয়েছে, কিন্তু গোপন বিপ্লবের পথ তাঁর পছন্দ হয়নি। অল্প কয়েকজন লোকের চেষ্টায় একটি-দুটি বিদেশি হত্যা— এ কাজে তাঁর রুচি জন্মায়নি।

আশ্চর্য কাণ্ড হল বি. এ. পরীক্ষায় সুভাষ সারা বিশ্ববিদ্যালয়ে দর্শন অনার্সে প্রথম শ্রেণীতে দ্বিতীয় স্থান পেয়ে দারুণ ভালো পাস করে গেলেন। আবার সেই ভালো ছেলেটা তেড়েফুঁড়ে বেরিয়ে এল। তাঁর বাবা-মা দাদারা এত ভালো ফল আশাই করতে পারেননি। সকলেই ভাবনায় ছিলেন এত ভালো ছেলেটা কলেজে পান্ডাগিরি আর রাজনীতি করে না গোল্লায় যায়। যেই সুভাষ ভালো ফল করলেন, জানকীনাথও অমনি তাঁকে প্রস্তাব দিলেন, 'যাও, তুমি বিলেতে গিয়ে আই সি এস পরীক্ষা দাও।'

বিলেত! সে তো এক স্বপ্ন! সেখানে গিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র হবেন, এমন সুযোগ ক-জনের আসে! আবার সুভাষের মধ্যেকার 'ভালো ছেলেটি' মাথা চাড়া দিয়ে উঠল, এই সুযোগ ছাড়তে চাইল না। এদেশে

ওই বছরে (১৯১৯) এপ্রিলে একটা ভয়ংকর ঘটনা ঘটেছে— জালিয়ানওয়ালাবাগের হত্যাকাণ্ড। এর কথা প্রথমেই তোমাদের বলেছি। সারা দেশ দুঃখে বিক্ষোভে অস্থির। রবীন্দ্রনাথ পরম ঘৃণায় নিজের 'স্যার' উপাধি ত্যাগ করেছেন। এ সবের মধ্যেই সুভাষ 'দ সিটি অফ ক্যালকাটা' জাহাজে উঠে পড়লেন বম্বে থেকে— ১৯১৯-এর ১৫ই সেপ্টেম্বর। তোমরা শুনে অবাক হবে, ওই জাহাজে রবীন্দ্রনাথও যাচ্ছিলেন বিলেতে।

বিলেতে কেম্‌ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে ক্লাস করার সুযোগ পেলেন। এখানে সঙ্গী হিসেবে পেলেন তাঁর প্রেসিডেন্সি কলেজের ঘনিষ্ঠ বন্ধু গায়ক দিলীপকুমার রায়কে। তাঁর খুব ভালো লাগল ইংরেজদের কাজ করবার ছটফটে আগ্রহ, ঘড়ির কাঁটা ধরে কাজ করার ইচ্ছে, 'কিছুতেই হাল ছেড়ে দেব না'— এইরকম মনের ভাব। আবার ছেলেমানুষের মতো খুশি হতেন যখন সাদা-চামড়ার লোক তাঁর ফাইফরমাশ খাটত বা জুতো পালিশ করে দিত।

সুভাষ নিজে খুব ফিটফাট থাকতেন সবসময়। ঘরের বইপত্র সব ঠিকঠাক গোছানো। কোথাও এলোমেলো কিছু নেই। একবার দিলীপকুমারকে ধুতি-পরা অবস্থায় ঘরের মেঝেয় আসন-পিঁড়ি হয়ে বসতে দেখে খুব বকে দিয়েছিলেন তাকে। ইংরেজরা দেখলে কী ভাববে? ওদের দেখাতে হবে যে, চলনে বলনে আদব কায়দায় ভারতীয়েরা তাদের চেয়ে কোনো অংশে খাটো নয়। বিলেতে এসে যেন তাঁর নিজের দেশ সম্বন্ধে অহংকার আরও বেড়ে গেল।

১৯২০-র জুলাইয়ে হল আই সি এস পরীক্ষা। সুভাষ পরীক্ষা দিয়ে খুশি হননি, ভেবেছিলেন পাস করতে পারবেন না। মাকেও লিখেছিলেন ওই কথা। আবার অবাক কাণ্ড—ওই সাংঘাতিক কঠিন পরীক্ষায় ৪র্থ স্থান পেয়েছেন তিনি, আর ইংরেজিতে একেবারে সকলের চেয়ে বেশি নম্বর। বাড়ির সকলে দারুণ খুশি। সবাই ভাবলেন, এবার সুভাষ দেশে ফিরে এসে একটা ভারী জাঁকালো চাকরি পাবেন। ওই যাদের বলা হত স্বর্গে জন্মেছে এরা— সেই জেলা ম্যাজিস্ট্রেট থেকে বিভাগের কমিশনার, তা থেকে মন্ত্রীর সেক্রেটারি— কী না হতে পারবেন এই উজ্জ্বল সুন্দর যুবক। শুধু তাঁর দেশে ফেরার অপেক্ষা।

সবাই যেমন ভেবেছিল তেমন হল না। এর পরেই সুভাষের জীবনটা একেবারে অন্য দিকে ঘুরে গেল। তিনি বাড়িতে লিখলেন, তার ওই শাঁসালো চাকরি করে বিদেশি রাজার সেবা করার একেবারেই ইচ্ছে নেই। বরং তিনি দেশের সেবা করে বাকি জীবনটা কাটাতে চান।

ভাবো একবার পাগলামিটা! কোথায় রাজার চাকরি— তাতে অনেক টাকা, অনেক ক্ষমতা, অনেক সম্মান। তাতে গাড়ি বাড়ি সুখ স্বাচ্ছন্দ্য বিলেতবাস— সব কিছু আছে। আর তা না, কোথায় দেশের কাজ— তাতে জেল, দ্বীপান্তর, ফাঁসি— কী নেই। অনেক কষ্ট, অনিশ্চিত জীবন— হয়তো রাজার পুলিশের হাতে সৈন্যের হাতে মৃত্যু। বাবা জানকীনাথ তো শুনে আঁতকে উঠলেন, বাড়িতে হাহাকার পড়ে গেল। শুধু দাদা শরৎচন্দ্র বসু বাবা আর মাকে বোঝালেন। সুভাষ যা করছে ঠিকই করছে। শরৎচন্দ্রও দেশের কাজে এগিয়ে এসেছিলেন, তাই ছোটো ভাইকে তাঁর পথেই আসতে দেখে তিনি খুশিই হলেন, তাঁকে সবরকমভাবে সাহায্য করতে লাগলেন। দাদার সমর্থন সুভাষের মনের জোর অনেকটাই বাড়িয়ে দিল। তিনি ব্রিটিশ রাজের ভারত বিষয়ে সেক্রেটারি ই এস মন্টেগুর কাছে চিঠি লিখে অনুরোধ করলেন, অনুগ্রহ করে আই সি এস চাকুরি প্রার্থীদের তালিকা থেকে আমার নাম কেটে দিন। লিখে দেশে ফেরার জাহাজে চড়ে বসলেন।

১৬ জুলাই ১৯২১-এ মুম্বই-এ জাহাজ থেকে এসে নামলেন ২৪ বছরের সুভাষ। প্রথমেই যাঁর সঙ্গে দেখা করলেন তিনি মহাত্মা গান্ধি। তিনি কীভাবে দেশের কাজ করতে চান গান্ধিজিকে বললেন, আবার গান্ধিজিকেও প্রশ্ন করলেন এ ব্যাপারে তাঁর কী পরিকল্পনা! গান্ধিজির কথায় পুরোপুরি খুশি হতে পারলেন না। কিন্তু বুঝতে পারলেন, ওই একটি মানুষই দেশের সমস্ত লোকের মনে সাড়া তুলতে পেরেছেন। এমন করে আর কোনো নেতা পারেননি। শেষে গান্ধিজি বললেন, তুমি কলকাতায় ফিরে গিয়ে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের সঙ্গে দেখা করো, হয়তো তিনিই তোমাকে ঠিক পথের সন্ধান দিতে পারবেন।

গান্ধিজি ঠিকই বলেছিলেন। এই দুজনে যে খুব মিলবে, চিত্তরঞ্জন যেমন গুরু সুভাষচন্দ্র যে তাঁর তেমনই চ্যালা হয়ে উঠবেন তা তিনি

বুঝতে পেরেছিলেন। দুজনেই প্রায় সর্বস্ব ছেড়ে দিয়ে দেশকে স্বাধীন করার আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়েছেন। চিত্তরঞ্জন ছেড়েছেন দৈনিক ষোলো হাজার টাকা রোজগারের আইন ব্যবসায়, সুভাষচন্দ্র ছেড়েছেন আই সি এসের স্বপ্নের ভবিষ্যৎ। এবার ছাড়লেন সাহেবি পোশাক। দুজনে যেন দুজনের জন্যই অপেক্ষা করছিলেন।

কেমব্রিজে থাকতেই সুভাষচন্দ্র চিত্তরঞ্জনকে চিঠি লিখেছিলেন। এবার তাঁর সঙ্গে দেখা হওয়ার পর তাঁর মনে হল, 'এই এতদিনে আমি আমার গুরুর দেখা পেলাম।' চিত্তরঞ্জনও দু-হাত বাড়িয়ে সুভাষচন্দ্রকে বুকে টেনে নিলেন। সুভাষ চিত্তরঞ্জনের স্ত্রী বাসন্তী দেবীর ছেলেই হয়ে গেলেন যেন। চিত্তরঞ্জন তখনই তাঁর হাতে তুলে দিলেন তখনকার জাতীয় কলেজের অধ্যক্ষের দায়িত্ব, জাতীয় স্বেচ্ছাসেবী বাহিনীর নেতৃত্ব, আর বাংলার প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির প্রচার পরিচালনার ভার। কলেজে তখনও তেমন ছাত্র জোটেনি, তাই খালি ক্লাসঘরে সুভাষ তাঁর চেয়ারটেবিলে বসে প্রায়ই লিখতেন বাংলার কংগ্রেসের মুখপত্র 'বাংলার কথা'-র জন্য নানা লেখা।

এ সময় মহাত্মা গান্ধির নেতৃত্বে সারা ভারত জুড়ে চলছে অসহযোগ আন্দোলন। ইংরেজ সরকারের সঙ্গে কোনো সহযোগিতা নয়। ইংরেজের কোর্ট-আদালত বয়কট করো, ইংরেজি ধরনের স্কুল-কলেজ ছেড়ে বেরিয়ে এসো। গান্ধিজি বললেন 'এক বছরের মধ্যে স্বরাজ এসে যাচ্ছে, ইংরেজের গোলামখানা থেকে সক্কলে বেরিয়ে পড়ো।' হাজার হাজার ছেলেমেয়ে স্কুল-কলেজ ছেড়ে অসহযোগ আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়ল। এই ঝড়ের মধ্যে উন্মাদনার মধ্যেই তো সুভাষের আনন্দ। এ সবই তাঁর পরীক্ষার সুযোগ, তাঁর কেমন নেতা হওয়ার যোগ্যতা আছে তা দেখিয়ে দেওয়ার সুযোগ।

বেচারা ইংল্যান্ডের যুবরাজ প্রিন্স অব ওয়েল্‌স। এই ডামাডোলের মধ্যে তিনি তাঁর ভারত-সাম্রাজ্যের অবস্থা দেখতে ভারতে এসেছিলেন। ইচ্ছে, এদেশের প্রজাদের কিছু সুখসুবিধে দেওয়া। কিন্তু দেশের মানুষ জালিয়ানওয়ালাবাগের জ্বালা ভুলতে পারেনি। যুবরাজ ১৩ নভেম্বর (১৯২১) জাহাজ থেকে মুম্বইয়ের মাটিতে পা দিলেন তো সারা দেশে

হরতাল শুরু হয়ে গেল। রাজার ছেলে তো কী হয়েছে, তাঁর মুখ দেখতে চাই না আমরা। কলকাতায় হরতাল করার মূল দায়িত্ব চিত্তরঞ্জন দিয়েছিলেন সুভাষকে। কলকাতাতেও পুরো হরতাল— সেদিন শহর যেন শ্মশান। তারপরেও অসহযোগ আন্দোলন চলতেই লাগল। এদিকে বাসন্তী দেবী মেয়ে ভলান্টিয়ারদের নিয়ে বিলিতি জিনিস বিক্রি বন্ধ রাখার জন্য রাস্তায় রাস্তায় দোকানিদের অনুরোধ করছেন, সুভাষ বেরিয়ে পড়েছেন তাঁর হাজার হাজার ভলান্টিয়ার নিয়ে। ইংরেজ সরকারের চাকর লাঠিধারী পুলিশ মহাবীরদের আর পায়কে! তারা অস্ত্রহীন স্বেচ্ছাসেবীদের ওপর লাঠি চালিয়ে তাদের রাস্তায় ফেলে মারতে লাগল, মেয়ে পুরুষ বাছল না। হাজারে হাজারে ছেলেমেয়ে গ্রেপ্তার হল— সকলের সঙ্গে চিত্তরঞ্জন আর সুভাষও গ্রেপ্তার হলেন (১০ ডিসেম্বর)। ১৯২২-এর ৭ ফেব্রুয়ারি আদালত তাঁকে ছ-মাসের জেল খাটার শাস্তি দিল। সুভাষ তো এই চাইছিলেন। দুষ্টুমির হাসি হেসে বিচারককে বললেন, 'মোটে ছ-মাস?'

বাবা জানকীনাথ এবার মেজদা শরৎ বসুকে চিঠি লিখলেন, 'সুভাষ আর তোমাদের সকলের জন্য আমি গর্বিত।'

এগারো বার জেলে যেতে হবে সুভাষকে— তার এই শুরু হল। কিন্তু আলিপুরের এই জেল যেন সুভাষের কাছে যেন খুব সুখের জায়গা। গুরু চিত্তরঞ্জনের সেবা করছেন প্রাণভরে, এমনকি তাঁর জন্যে দুবেলা রান্নাও করছেন, নিজে তাঁকে সামনে বসে খাওয়াচ্ছেন। দেশের অন্যান্য নেতা চিত্তরঞ্জনকে ঠাট্টা করছেন, 'বাব্বা, আপনার কী কপাল। রান্না করার লোক পেয়েছেন একেবারে আই সি এস।' গুরুর সঙ্গে হাসিতে ঠাট্টায় গানে কবিতা আবৃত্তিতে জেলখানা আর জেলখানা রইল না সুভাষের কাছে।

অসহযোগ আন্দোলনে যখন সারা দেশ উত্তাল, যখন মনে হচ্ছিল যে, এই আন্দোলনের প্রবল ঢেউ সত্যি সত্যি এক বছরের মধ্যে ইংরেজদের তাড়িয়ে ছাড়বে, তখন একটা ঘটনা ঘটল। উত্তরপ্রদেশের চৌরিচৌরা নামে একটা জায়গায় পুলিশের অত্যাচারে উত্তেজিত জনতা থানায় আগুন ধরিয়ে পুড়িয়ে মারল কিছু পুলিশকে। বিপ্লবে এমন ঘটে,

কিন্তু গান্ধিজি এতে এমনই আঘাত পেলেন যে, তিনি হঠাৎ বললেন, 'ব্যস্, আন্দোলন আজ থেকে বন্ধ।' এক মুহূর্তে স্তব্ধ করে দিলেন অসহযোগের সমস্ত উৎসাহ আর উন্মাদনা।

দেশবন্ধু, পণ্ডিত মতিলাল নেহরু, তরুণ সুভাষচন্দ্র বিস্ময়ে ক্ষোভে ফেটে পড়লেন। এ কী কাণ্ড? সারা দেশ জেগে উঠেছে, এই দুর্ধর্ষ জোয়ারে ইংরেজ ভেসেই যাচ্ছিল আর একটু হলে, আর গান্ধিজি কি না এক কথায় তাকে থামিয়ে দিলেন। কী অধিকার আছে তাঁর? দেশের স্বরাজকে যেন হঠাৎ পিছিয়ে দিলেন গান্ধিজি ওই ফতোয়া জারি করে।

এর মধ্যে বাংলায় ঘটেছে এক ভয়াবহ বন্যা—রাজশাহি, দিনাজপুর, পাবনা, বগুড়া, রংপুর সব জেলায় বন্যাত্রাণে ঝাঁপিয়ে পড়লেন সুভাষচন্দ্র তাঁর স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী নিয়ে। অসাধারণ তাঁর সংগঠন ক্ষমতা, অসাধারণ তাঁর নেতৃত্ব। বাংলার লাটসাহেব লর্ড লিটন নিজে প্রশংসা করলেন সুভাষ আর তাঁর সেবাদলের কাজকে।

ওদিকে কংগ্রেসের মধ্যে গান্ধিজির পথ থেকে আলাদা হয়ে গেলেন দেশবন্ধু আর মতিলাল নেহরু। ১৯২২-এ গয়া কংগ্রেসের অধিবেশনের পরই তাঁদের 'স্বরাজ দল' গঠিত হল। সুভাষচন্দ্র 'বাংলার কথা' আর ইংরেজি 'ফরোয়ার্ড' পত্রিকায় অন্তহীন রাজনৈতিক প্রচার চালাতে লাগলেন।

পাঁচ

স্বরাজ দল এর মধ্যে ইংরেজ সরকারের প্রশাসনে ঢুকে পড়বার নীতি নিয়েছে, তারা নির্বাচনে অংশ নিচ্ছে। এবং সব জায়গাতেই তারা বাঘা বাঘা পুরোনো কংগ্রেসিদের হারিয়ে দিচ্ছে। রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতো প্রবীণকে হারিয়ে দিলেন চিত্তরঞ্জনের আর-এক তরুণ শিষ্য বিধানচন্দ্র রায়। ১৯২৪-এ কলকাতা করপোরেশনের নির্বাচনে চিত্তরঞ্জনের দল আর সবাইকে যেন মুছে দিল। একবছর আগেই সুভাষ হয়েছেন প্রদেশ কংগ্রেসের সম্পাদক। এবার দেশবন্ধু হলেন মেয়র, আর সাতাশ বছরের তরুণ সুভাষ হলেন পুরসভার প্রধান কর্মকর্তা। যে পদ এতদিন ইংরেজের ছিল, সুভাষ তা দখল করলেন। দখল করেই ৩০০০ টাকা মাইনের অর্ধেক দান করতে লাগলেন দেশের জন্যে।

কলকাতা করপোরেশনের হালচাল বদলে দিলেন গুরু আর শিষ্য। শস্তা খাবার আর দুধ সরবরাহ, পরিষ্কার জলের ব্যবস্থা, বস্তি উন্নয়ন, যানবাহনের সুব্যবস্থা, শহরতলির উন্নয়ন— এইসব নানা পরিকল্পনা নিয়ে তাঁরা ইংরেজদের চেয়ে অনেক ভালোভাবে চালাতে লাগলেন এই শহর। তার কারণ মূলত দুটো। প্রথমত চিত্তরঞ্জন আর সুভাষচন্দ্রের কর্মদক্ষতা যেমন অসাধারণ ছিল, তেমনই ছিল তাঁদের দেশের মানুষের জন্যে, বিশেষ করে গরিব মানুষের জন্যে ভালোবাসা। ইংরেজরা তো শুধু নিজেদের সুখসুবিধেই দেখত।

সুভাষ প্রত্যেক মাসে তাঁর তিন হাজার টাকা মাইনের অর্ধেকটা দান করে দিতে লাগলেন মানুষের সেবার জন্যে। খদ্দরে তৈরি হতে লাগল করপোরেশনের শ্রমিকদের পোশাক। সরকার দেখল, এরা যেভাবে চালাচ্ছেন, তাতে দুদিনেই লোকে বুঝে ফেলবে নিজেদের শাসন কত

ভালো। ব্যস, সঙ্গে সঙ্গে হাজার হাজার কংগ্রেসকর্মীদের সঙ্গে সুভাষকেও আবার গ্রেপ্তার করা হল। বলা হল, তিনি ব্রিটিশ শাসন উলটে দেওয়ার জন্যে গোপনে ষড়্যন্ত্র করছিলেন। এ এক ভয়ংকর মিথ্যে কথা, বানানো গল্প। সুভাষ এ ক-মাস শহরের ভালো করবার জন্যে করপোরেশনের কাজে মনপ্রাণ ঢেলে দিয়েছিলেন।

শিষ্যের গ্রেপ্তারে রাগে দুঃখে ফেটে পড়লেন মেয়র চিত্তরঞ্জন। বললেন, 'সুভাষ রাজার বিরুদ্ধে ষড়্যন্ত্র করেছে? তাহলে আমিও তা করেছি, আমাকেও গ্রেপ্তার করুক ওরা! দেশকে ভালোবাসা কি অপরাধ? তাতে সুভাষ অপরাধী তো সেই একই অপরাধে আমিও অপরাধী, তো মেয়রকেও গ্রেপ্তার করুক।"

কে কার কথা শোনে। কলকাতা বহরমপুর ঘুরিয়ে সুভাষকে নিয়ে যাওয়া হল সেই বর্মার (এখন মিয়ানমার) মান্দালয় জেলে, দেশ থেকে অনেক দূরে। আমরা দেখব, শরীরের কষ্ট যা হোক, বন্দিদশার যা অসুবিধে থাক, সুভাষ কখনোই সে সব গায়ে মাখতেন না। মান্দালয়ে বসে আবার ধর্ম আর দর্শন নিয়ে পড়াশোনা শুরু করেছেন, বন্ধু দিলীপকুমার রায়কে চিঠি লিখছেন জীবনের অর্থ নিয়ে, দেশের মুক্তির কথা নিয়ে। এমন সময় পেলেন সেই মর্মান্তিক দুঃসংবাদ— হঠাৎ তাঁর গুরু দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের মৃত্যু হয়েছে দার্জিলিংয়ে (১৬ জুন, ১৯২৫)। আমরা অনুমান করতে পারি, কতটা আঘাত পেয়েছিলেন সুভাস সেই দূর বন্দিশালায় বসে, শেষ সময়ে গুরুর শয্যার পাশে থাকতে পারলেন না বলে, 'মা' বাসন্তী দেবীকে সান্ত্বনা দিতে পারলেন না বলে।

দীর্ঘ বন্দিদশায় সুভাষ চুপ করে বসে থাকবার ছেলে নন। সব বন্দিদের ডেকে বললেন, 'এবার জেলে দুর্গাপূজা করব।' জেলের কর্তারা বলল, 'কক্ষনো না।' সুভাষ বললেন, 'বটে!' বলে সুভাষ সঙ্গীদের নিয়ে অনশনে বসে গেলেন। 'পুজো করতে দেবে না তো আমরাও কিছু মুখে দেব না। আমাদের মৃত্যুর জন্যে তোমরা দায়ী হবে।'

পনেরো দিন পরে জেলের কর্তারা মাথা নীচু করে হার মানল। হ্যাঁ, দুর্গাপূজা করতে পারবে। বন্দিরা জয়ী হল, সারা দেশে আনন্দের উল্লাস

এবার জেলে দুর্গাপূজা করব

ছড়িয়ে গেল সেই খবরে। কিন্তু অনাহারে এর মধ্যে সুভাষের প্রায় দশ কেজি ওজন কমে গেছে, তাঁর শরীর একেবারেই ভেঙে পড়েছে। বুকে ব্রংকাইটিস-আর নিউমোনিয়া ধরেছে, হয়তো যক্ষ্মাও আছে তার সঙ্গে। ডাক্তাররা বললেন, অবিলম্বে এঁকে ছেড়ে দেওয়া হোক, নইলে এঁকে বাঁচানো যাবে না। ব্রিটিশ রাজ বলল, 'ছেড়ে দিচ্ছি, কিন্তু এরকম বিপজ্জনক লোককে ভারতে ফিরতে দেব না। ওকে ইয়োরোপে গিয়ে নিজের চিকিৎসা করাবার অনুমতি দিচ্ছি। তবে আমরা টাকাপয়সা কিছু দেব না, ওকে নিজের পয়সায় যেতে হবে, চিকিৎসা করাতে হবে।' কী দয়ালু রাজামশাই, ভাবো একবার। যাই হোক, এই শর্তের কথা শুনে দেশের লোক খেপে উঠল। তখন রাজ সরকার আর কী করবেন, সুভাষকে কলকাতায় ফিরিয়ে আনতে বাধ্য হলেন।

দেশের রাজনীতির অবস্থা তখন বেশ খারাপ। কংগ্রেসের মধ্যে প্রচুর ঝগড়াঝাঁটি। এই ঝগড়ার জন্যই করপোরেশন নির্বাচনে মেয়র পদে দাঁড়িয়ে হেরে গেলেন সুভাষ। তারই মধ্যে লর্ড সাইমনের নেতৃত্বে একটি দল এল ভারতে ইংরেজের শাসন কেমন চলছে তার হিসেব-নিকেশ করতে। তাতে কোনো ভারতীয় প্রতিনিধিই ছিল না, তাই সারা দেশ হরতাল করে তার প্রতিবাদ জানাল। পাঞ্জাব কেশরী (সিংহ) লালা লাজপত রায় পুলিশের লাঠির আঘাতে মৃত্যু বরণ করলেন। দেশ রাগে উত্তেজনায় পাগল হয়ে উঠল। কিন্তু যাঁর নেতৃত্ব দেবার কথা, সেই গান্ধিজি তাঁর সাবরমতী আশ্রমে চুপচাপ বসে আছেন। দেশের উত্তাল অবস্থায় ব্রিটিশ-বিরোধী সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়ছেন না। সুভাষ ছুটে গেলেন তাঁর কাছে, গান্ধিজি তাঁর আবেদনে কোনো সাড়াই দিলেন না। কলকাতায় যুব কংগ্রেসের অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি হিসেবে সুভাষ ক্ষুব্ধ স্বরে বললেন, 'এখন কি চোখ বুঝে আশ্রমে বসে ধ্যান করার সময়? দেশে লড়াইয়ের জোয়ার এসেছে, কোথায় আমরা সবাই মিলে ঝাঁপ দেব, না আমাদের সেই মান্ধাতার আমলে ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা চলছে।' সত্যি সত্যি তখন বম্বের কাপড়ের কলগুলোতে ধর্মঘট হচ্ছে, জামসেদপুরে টাটার কারখানা অচল হয়ে গেছে স্ট্রাইকে। এই তো সময়। কিন্তু কোথায় কে? শেষে সুভাষ নিজেই শ্রমিক-আন্দোলনে

জড়িয়ে পড়লেন। তাঁকে শ্রমিকরা সর্বভারতীয় ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের সভাপতি হিসেবে বরণ করে নিল। আর ১৯২৮-এ কলকাতার কংগ্রেসের অধিবেশনে ভলান্টিয়ারদের সর্বাধিনায়ক (G. O. C.— জেনারেল অফিসার কম্যান্ডিং) হিসেবে সৈন্যবাহিনীর অধ্যক্ষের মতো সম্পূর্ণ মিলিটারি পোশাকে সেজে এলেন তিনি। সকলের আগে ঘোড়ার উপর সোজা হয়ে বসা, কোমরে তরোয়াল, তাঁর সেই বীরের মূর্তি, অনেকেরই বুকে চিরস্থায়ী হয়ে আঁকা রয়েছে এখনও। তাঁর এই মূর্তিই আবার আমরা দেখব পরে, আজাদ হিন্দ ফউজের সর্বাধিনায়ক হিসেবে।

এর মধ্যে সুভাষ সারা দেশের রাজনৈতিক আন্দোলনে যুবকদের এক প্রধান নেতা হয়ে উঠেছেন। মিরাট ষড়যন্ত্র মামলায় (১৯২৯) বিপ্লবীদের ধরা হল— তাঁদের সুবিচার যাতে হয় সুভাষ তার ব্যবস্থা করতে ছুটে গেলেন। চৌষট্টি দিন অনশন করে আত্মদান করলেন মহান বিপ্লবী যতীন দাস— তাঁর শেষকৃত্যের ব্যবস্থা করতে এগিয়ে এলেন সুভাষ। সারা দেশে তরুণদের নানা সভা-সমিতি-সম্মেলনে তাঁর ডাক আসছে। আর তাঁর জনপ্রিয়তায় ভয় পেয়ে সর্বভারতীয় কংগ্রেস কমিটি তাঁকে একঘরে করবার চেষ্টা করছে। যে লাহোর কংগ্রেসে (১৯৩০) পূর্ণ স্বাধীনতার দাবি উঠল সেই কংগ্রেস অধিবেশনেই ওয়ার্কিং কমিটি থেকে সুভাষ তাঁর দলবলসহ বাদ পড়লেন। আর সেখান থেকে কলকাতায় ফেরা মাত্রই তাঁকে গ্রেফতার করে আবার জেলে পাঠাল ইংরেজ সরকার। এবার এক বছরের সশ্রম কারাবাস। কিন্তু মজার কথা হল, সুভাষ যখন আলিপুর জেলে বন্দি, তখনই তিনি নির্বাচিত হলেন কলকাতা করপোরেশনের মেয়র পদে।

যাই হোক, এর মধ্যে গান্ধিজিকে আর একটি আন্দোলন শুরু করতে হল। সমুদ্রের ধারে নোনা জল থেকে গরিব চাষীরা নুন তৈরি করে ব্যবহার করত। ব্রিটিশ সরকার তার ওপর অন্যায়ভাবে ট্যাক্স বসিয়েছিল। নুন তৈরি করলে সরকারকে টাকা দিতে হবে। গান্ধিজি বললেন, এই লবণ-কর তুলে নিতে হবে। বড়োলাট লর্ড আরউইন তাঁর কথায় কানই দিলেন না বলা চলে। তখন সারা দেশে লবণ-আইন অমান্য শুরু হয়ে গেল, অহিংস সত্যাগ্রহীদের উপর বীভৎস অত্যাচারও

চলল পুলিশের। সে অত্যাচার দেখে ইংরেজ সাংবাদিকরাও লজ্জিত হয়েছিল। কংগ্রেসের সমস্ত নেতাকে ধরে আবার জেলে বন্দি করা হল। সুভাষ এর মধ্যে ছাড়া পেয়েছেন।

যাই হোক, বড়োলাট বুঝলেন, এভাবে লোককে জেলে দিয়ে, পিটিয়ে দেশকে ঠাণ্ডা করা যাবে না। তিনি গান্ধিজির সঙ্গে একটা বোঝাপড়ায় আসার চেষ্টা করলেন। হঠাৎই কংগ্রেসের নেতাদের ছেড়ে দিলেন। সেদিন গান্ধিজি জেল থেকে বেরোলেন, সেদিনই কলকাতায় এক মিছিলে কলকাতার মেয়র যে সুভাস, তাকে পুলিশ লাঠি দিয়ে পেটাল। পরদিন রক্তাক্ত জামাকাপড়ে আদালতে নিয়ে আসা হল তাকে। আবার ছ-মাসের জেল। কিন্তু এবার ছ-মাস কাটাতে হয়নি জেলে।

এর মধ্যে বড়োলাট লর্ড আরউইন গান্ধিজিকে অনুরোধ করলেন, আপনি কিছুদিন এই আন্দোলন-টান্দোলন বন্ধ রাখুন, আসুন লন্ডনে টেবিলের চারপাশে বসে আমরা আলোচনা করি। একথা শুনে ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী চার্চিল সাহেব খেপে আগুন— 'কী! একটা নেংটি-পরা ফকির রাজার প্রতিনিধিদের সঙ্গে সমানে সমানে কথা বলবে!' কিন্তু আরউইন চার্চিলকে বোঝালেন, এ না হলে ভারতে শান্তির আশা নেই। এদিকে সবাই ভেবেছিল গান্ধিজি আন্দোলন বন্ধ করতে রাজি হবেন না, স্বরাজের জন্য লড়াই চালিয়ে যাবেন। কিন্তু কী আশ্চর্য, গান্ধিজিও রাজি হয়ে গেলেন, লন্ডনে চলে গেলেন 'গোল টেবিল বৈঠক'-এ কথা বলার জন্য।

সুভাষ এতে বেশ দুঃখ পেলেন। বললেন 'আন্দোলন এভাবে বন্ধ করা উচিত হয়নি।' যাই হোক, গোলটেবিল বৈঠক ব্যর্থ হল। অন্যদিকে দেশে ইংরেজদের অত্যাচারও পুরোদমে চলতে লাগল। গান্ধিজি ফিরে আসার পর ১৯৩২-এর গোড়াতেই আবার সব নেতাকে জেলে পোরা হল, সুভাষও বন্দি হলেন। আশ্চর্য সরকারের কোনো অভিযোগ নেই, জেলে পোরার আনন্দেই তাঁকে ধরে নিয়ে যাওয়া হল। প্রায় পঞ্চাশ হাজার স্বেচ্ছাসেবক গ্রেপ্তার হল। কিন্তু জেল থেকে জেলে চালাচালি হতে হতে সুভাষের স্বাস্থ্য এবার একেবারে ভেঙে পড়ল। মান্দালয়

থেকেই এই ভাঙন শুরু হয়েছিল। তারই মধ্যে তিনি অন্যান্য বন্দিদের রাজনীতির ক্লাস নিয়েছেন, তাঁর ইংরেজি আত্মজীবনী *দি ইন্ডিয়ান স্ট্রাগ্‌ল* 'ভারতের সংগ্রাম'-এর প্রথম খসড়া লিখেছেন। সরকার বেগতিক দেখে তাঁকে ভাওয়ালি স্বাস্থ্যনিবাসে পাঠিয়ে দিল, কিন্তু তাতেও তাঁর স্বাস্থ্যের কোনো উন্নতি দেখা গেল না। তখন সরকার বাধ্য হয়ে বলল, ঠিক আছে, আপনাকে ছেড়ে দিচ্ছি। কিন্তু আপনার দেশে থাকা চলবে না। আপনি নিজের পয়সায় টিকিট কেটে ইয়োরোপে চলে যান— ভিয়েনাতে গিয়ে চিকিৎসা করান। জেল থেকে জেল ঘুরিয়ে মুম্বইয়ের ট্রেনে তুলে দেওয়া হল তাঁকে। সেখান থেকে সোজা জাহাজে। বাড়িতে বাবা-মার সঙ্গে দেখা করবেন ভেবেছিলেন, সরকার বলল, 'সেসব হবে না।' এমন বিপজ্জনক লোককে যত তাড়াতাড়ি যত দূরে পাঠানো যায় ততই ভালো।

ছয়

ব্রিটিশ সরকার ভাবল, আপদ বিদায় হল, এবার অন্তত এর দিক থেকে আর কোনো অশান্তি হবে না। ইয়োরোপে সুভাষ নিজের শরীর সারাতে ব্যস্ত থাকবেন। আরামে দিন কাটাবেন। এবার তাঁর স্বাধীনতার রোগও সেরে যাবে।

সুভাষ কি সেই ছেলে? চিকিৎসার নাম করে যেখানেই যাচ্ছেন সেখানেই ভারতের স্বাধীনতার লড়াইয়ের জন্য জনমত তৈরি করছেন, সরকারি স্তরে যাতে সাহায্য পাওয়া যায় তার চেষ্টা করছেন। অস্ট্রিয়ার ভিয়েনাতে মুহূর্তে তৈরি করে ফেললেন অস্ট্রীয় ভারতীয় সমিতি। চে-কাস্লোভাকিয়ার এখন দুটি রাষ্ট্র—চেক্ আর শ্লোভাকিয়া প্রজাতন্ত্র কার্লোভি ভারি-তে উষ্ণ প্রস্রবণে স্নান করে শরীর সারাতে গেলেন তো সেদেশের বিদেশমন্ত্রী ডা. বেনেস-এর সঙ্গে কথা বলে এলেন ভারতের স্বাধীনতার লড়াই নিয়ে। রাজধানী প্রাহাতে তৈরি করে ফেললেন চেক-ভারত সমিতি। পোলান্ডে গেলেন। সেখানে জানলেন, জাপানে একসময় পোলান্ডের সেনাবাহিনীর একটা দল ট্রেনিং পেয়েছিল। কথাটা নিশ্চয়ই তাঁর মনে গেঁথে গেল। লন্ডন রাজার দেশের রাজধানী, সেখানে সুভাষের যাওয়া বারণ। কিন্তু সেখানে রাজনৈতিক সম্মেলনে সভাপতি হওয়ার আমন্ত্রণ পেলেন সুভাষ। যেতে না পারলে কী হবে, ভিয়েনা থেকে বক্তৃতা পাঠিয়ে দিলেন পড়বার জন্য।

পোলান্ড থেকে এলেন জার্মানির রাজধানী বার্লিনে (জুলাই ১৯৩৩)। সেখানে যাচ্ছেন সেখানকার ইতিহাসের পাঠ নিচ্ছেন। বোঝাবার চেষ্টা করছেন কীভাবে এই জাতি এমন জায়গায় একে পৌঁছোল। সুভাষ ভেবেছিলেন হিটলারের সঙ্গে দেখা করে তাঁকে ভারতের স্বাধীনতার লড়াইয়ে অস্ত্রশস্ত্র দিয়ে সাহায্য করতে অনুরোধ করবেন। কিন্তু এ যাত্রা

হিটলারের সঙ্গে তাঁর দেখা হল না। জার্মানরা তখনও ইংরেজদের চটাতে চায়নি, তাই ভেবেছিল ইংরেজদের সঙ্গে যে লড়াই করতে চায় তাকে বিশেষ পাত্তা দিয়ে কাজ নেই। তবে বার্লিনে তাঁর ভারতীয় বিপ্লবীদের একটা দলের সঙ্গে যোগাযোগ হল, কিছু উচ্চপদস্থ জার্মানও তাঁর চেষ্টার প্রতি সমর্থন জানালেন। জার্মানির জাতীয় সমাজবাদী দল বা নাট্‌সি পার্টির মতামত সুভাষের খুব একটা পছন্দ ছিল না, তবু কী করে তারা এমন দুর্ধর্ষ দল তৈরি করল সেটা তিনি বোঝার চেষ্টা করলেন।

এই সময় ভিয়েনাতেই সুভাষ তাঁর আত্মজীবনীর অধিকাংশ লেখা শেষ করলেন। এই কাজে টাইপ করে তাঁকে সাহায্য করেছিল অস্ট্রিয়ার মেয়ে। একটি এমিলি শেংক্‌ল। বইটি লন্ডন থেকে ১৯৩৫ সালে প্রকাশিত হল। পরে দেশ থেকে আশ্চর্যভাবে পালিয়ে সুভাষ যখন দ্বিতীয়বার জার্মানিতে আসবেন, এমিলিকে স্ত্রী হিসেবে গ্রহণ করলেন তিনি।

এখনও সে সব অনেক দূরে। ইয়োরোপে থাকতে থাকতে সুভাষ যেন ইতিহাসের ছাত্র হয়ে গেছেন। রাশিয়ার পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা হচ্ছে— তাঁর সম্বন্ধে সব খবর নিলেন। ভাবলেন, বাঃ এ তো চমৎকার ব্যাপার! শুধু বিদেশি রাজাকে তাড়ালেই হবে না, দেশকে সব দিক দিয়ে ভরে তুলতে হবে। ফসলের উৎপাদন বাড়াতে হবে, নতুন কারখানা বসাতে হবে, সবাইকে কাজ দিতে হবে, সব ছেলেমেয়েদের ইশকুলের ব্যবস্থা করতে হবে— এ না হলে স্বাধীনতার কোনো মানে হয়? স্বাধীনতা মানে কি শুধু সরকারের গদি দখল?

ইতালিতে গেলেন, সেখানে খবর নিলেন কীভাবে আগের শতাব্দীতে মাৎসিনি ইতালির তরুণ সমাজকে জাগিয়ে তুলেছিলেন, কীভাবে 'কারবোনিয়েরি'-দের দিয়ে গেরিলা যুদ্ধ চালিয়েছিলেন। ইতালিতে রাষ্ট্রপ্রধান মুসোলিনির সঙ্গে অবশ্য সাক্ষাৎ হল তাঁর। মুসোলিনি জিজ্ঞেস করেছিলেন, 'অস্ত্র নিয়ে লড়াই করবেন, না শুধু বক্তৃতা আর আন্দোলন করবেন।' সুভাষ বললেন, 'আমার লড়াই হবে সশস্ত্র।' মুসোলিনি বললেন, 'তাহলে আপনার জয় নিশ্চয়ই হবে। কিন্তু খুব সাবধানে, প্রত্যেকটা ধাপ আপনাকে ভেবে ছক করে নিতে হবে, ঝোঁকের মাথায় ঝাঁপিয়ে পড়লে চলবে না।'

মুসোলিনি জিজ্ঞেস করেছিলেন, 'অস্ত্র নিয়ে লড়াই করবেন, না শুধু বক্তৃতা আর আন্দোলন করবেন

আয়ার্ল্যান্ডে যেতেই হবে সুভাষকে। ওই ছোট্ট একটা দেশ দীর্ঘদিন লড়াই করে ইংল্যান্ডের হাত থেকে নিজের স্বাধীনতা ছিনিয়ে নিয়েছে। তার বরেণ্য নেতা ইমন ডি ভ্যালেরার কাছে যেন ওই জয়ের রহস্য তাঁকে জেনে নিতে হবে। জার্মানরা আয়ার্ল্যান্ডকে সাহায্য করতে চেয়েছিল। তার আর ভারতের অবস্থার মধ্যে আরও অনেক মিল ছিল। আয়ার্ল্যান্ডে এসে ডি ভ্যালেরার সঙ্গে অনেকক্ষণ আলোচনা করলেন তিনি। তারপর ছুটে গেলেন তুরস্কে! সেখানে কামাল আতাতুর্ক কীভাবে সারা দেশকে জাগিয়ে তুলেছেন তা স্বচক্ষে দেখলেন। তাঁর মনে হল, ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে এই সমস্ত দেশগুলো থেকেই শিক্ষা নেবার আছে। তাঁর দুঃখ রয়ে গেল যে, যোগাযোগের অভাবে সোভিয়েত দেশে যাওয়া হল না তাঁর। বিপ্লবের পর সেই দেশ কী অসাধারণ পরিবর্তন ঘটেছে, শোষিত মানুষের শিক্ষার আলো ক্ষুধার অন্ন মানুষের সম্মান পেয়ে কীভাবে জেগে উঠেছে তা তাঁর দেখাই হল না। পরে কংগ্রেসের সভাপতি হিসেবে তিনি সোভিয়েতের ধরনেই পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার কথা ভাববেন। দেশগঠনের এক নতুন অস্ত্র খুঁজে পাবেন সোভিয়েতের ইতিহাস থেকে। কিন্তু সে দেশে যাওয়ার সুযোগ হল না— এ দুঃখ তাঁর রয়েই গেল।

সুভাষই জাতীয় নেতাদের মধ্যে সকলের আগে বুঝেছিলেন, ভারতের স্বাধীনতার লড়াই শুধু দেশের ছোটো সীমানার মধ্যে বসে করা ঠিক নয়। এ লড়াইকে সারা পৃথিবীতে ছড়িয়ে দিতে হবে। তাঁর মতো করে কেউ ভাবেনি এ কথা, তাঁর মতো করে কেউ ছুটে যায়নি পূর্বে-পশ্চিমে। তাঁর মতো করে কেউ সাক্ষাৎ করেনি দেশবিদেশের মনীষী ও রাষ্ট্রনায়কদের সঙ্গে। এর পরে সুভাষ ফিরে আসবেন ভারতে, কিন্তু সারা পৃথিবীর স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসের পাঠ নিয়ে ফিরবেন। তাঁর দৃষ্টি আর কাজ শুধু ভারতের গণ্ডিতে আটকে থাকবে না। ইয়োরোপে বসে সারা পৃথিবীর এই সংগ্রামকে বোঝাবার জন্য তাঁর সাধনা ছিল যেমন কঠোর তেমনই তীব্র। দিনে মানুষজনের সঙ্গে দেখাসাক্ষাৎ, বক্তৃতা, আলোচনা; রাত্রে সারারাত পড়াশোনা, লেখার কাজ। ভোররাত চারটে-পাঁচটায় ঘুমিয়ে বেলা এগারোটায় ওঠা। শরীরের কথা ভাববেন সে সময় কোথায়?

সাত

৮ এপ্রিল (১৯৩৬) সুভাষের জাহাজ মুম্বইয়ে এসে ভিড়ল। ব্রিটিশ সরকার তাঁকে বিদেশে পাঠিয়ে নিশ্চিন্তে ছিল। তারা যখন দেখল সেই বেপরোয়া ছেলেটি আবার ফিরে আসছে তাঁর ভালোরকম অভ্যর্থনার জন্য তৈরি হল। মাটিতে পা রাখার আগেই গ্রেপ্তার করে পুণের ইয়েরোড়া প্রাসাদে বন্দি করা হল তাকে।

সারা দেশ উত্তাল বিক্ষোভে ফেটে পড়ল। ২০-এ মে হল দেশ জুড়ে হরতাল। এই বন্দিদশায় সুভাষের স্বাস্থ্য ভেঙে পড়ল। দশ মাস পরে জেল থেকে ছাড়া পেলেন তো তাঁর ডাক্তার তাঁকে ডালহৌসি পাহাড়ে পাঠিয়ে দিলেন। সেখানেও শরীর তেমন সারল না। ফলে কিছু দিন পর জার্মানির অস্ট্রিয়া অঞ্চলে বাডগাস্টাইন স্বাস্থ্যকেন্দ্রে যেতে হল তাঁকে। এখানেই আবার এমিলি শেংক্‌লকে পেলেন সেক্রেটারি হিসেবে আবার এখানেই শুনলেন ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের হরিপুরা অধিবেশনে তাঁকে সর্বসম্মতিক্রমে সভাপতি নির্বাচিত করা হবে। বাডগাস্টাইন থেকে ভাষণে তিনি বললেন সেই কথা, 'এবার ভারতের সংগ্রামকে এমনভাবে সারা পৃথিবীতে ছড়িয়ে দিতে হবে যেমন আগে কখনও হয়নি। আমাদের লড়াই একটিমাত্র দেশের লড়াই নয়। সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে সারা পৃথিবীর সংগ্রাম।'

এবার লন্ডনে যেতে তাঁকে বাধা দেওয়া হল না। সেখানে সেন্ট প্যানক্রাস টাউন হলে তাঁর বক্তৃতায় সভাপতিত্ব করলেন তাঁরই সমবয়সি কমিউনিস্ট নেতা রজনী পাম দত্ত। এই সভাতেই তিনি ঘোষণা করলেন স্বাধীন ভারতের শাসনব্যবস্থা হবে সমাজতান্ত্রিক।

১৮ জানুয়ারি (১৯৩৮) লন্ডনে বসেই জানলেন পাকা খবর— সত্যই তিনি জাতীয় কংগ্রেসের সভাপতি হয়েছেন। এ এক দুর্লভ

সম্মান। সেই ১৯২৮-এ কলকাতায় জাতীয় কংগ্রেসের স্বেচ্ছাসেবক বাহিনীর সর্বাধিনায়ক থেকে একেবারে জাতীয় কংগ্রেসের সর্বাধিনায়ক। সুভাষ তখনও জানতেন না এই সম্মান তাঁর কাঁটার মুকুট হয়ে উঠবে। জাতীয় কংগ্রেসের প্রবীণ নেতাদের একাংশ মোটেই পছন্দ করবো না তাঁর এই সম্মান। তাঁরা সব কাজে যেমন বাধা দিতে থাকবেন তেমনই তরুণদের একটি দলও তাঁর সঙ্গে যোগ দেবে না।

২৪ জানুয়ারি সুভাষ ফিরে এলেন কলকাতায়। এবার তাঁকে যেতে হবে গুজরাটের অখ্যাত শহর হরিপুরায়, সেখানে আনুষ্ঠানিক ভাবে তাঁকে সভাপতিত্বে বরণ করা হবে। সেখানে পঞ্চাশ হাজার লোকের থাকার মতো এক বিশাল শহর তৈরি হয়েছে প্রায় রাতারাতি। বারদৌলি থেকে হরিপুরাতে এলেন গাড়িতে। তারপর বিঠল নগরের সভাস্থল পর্যন্ত দু-মাইল পথ তাঁকে একান্নটি বলদের এক রথে চড়িয়ে টেনে নেওয়া হল। হাজার হাজার গ্রামবাসী দু পাশে ঘিরে থেকে মালাতে সংবর্ধনায় অস্থির করে তুলল তাঁকে।

সভাপতির দীর্ঘ বক্তৃতাতেও সুভাষ বললেন তাঁর স্বপ্নের কথা। লেনিনের কথা তুললেন। বললেন সমাজতান্ত্রিক ভারত তাঁর লক্ষ্য। শ্রমিক আর কৃষকদের অধিকার প্রতিষ্ঠা করতে হবে, গরিব দেশের গরিব চেহারা ঘুচিয়ে দিতে হবে।

এসব কথা শুনে ভারতের বামপন্থীরা খুশি হলেও কংগ্রেসের পুরোনো লোকজন তা বিশেষ পছন্দ করল না। অন্যদিকে নেহরুরা জার্মানির সঙ্গে সুভাষের যোগাযোগ ভালো চোখে দেখেননি। ফলে কংগ্রেসের মধ্যেই সুভাষকে দু-দিকে দু-রকম লড়াই করতে হবে, এমনটা আস্তে আস্তে স্পষ্ট হয়ে উঠল। সুভাষ ক্রমশ বুঝলেন, তিনি নামে সভাপতি হলেও কংগ্রেসের সমস্ত ক্ষমতা ধরে আছে তার ওয়ার্কিং কমিটি, যার কাছে গান্ধিজির ইচ্ছাই শেষ কথা। কংগ্রেসের মধ্যে সুভাষের নিজের লোক কম। ফলে দেশের স্বার্থে যে ধরনের পরিবর্তনের কথা তিনি ভাবছিলেন তা বলতে গিয়ে তিনি পদে পদে বাধা পেতে লাগলেন।

তবু ভেবেছিলেন, আর-একবার সভাপতি হতে পারলে তিনি দলকে বোঝাতে পারবেন স্বাধীনতা এক্ষুনি কেন চাই, আর স্বাধীনতার পরে

সভাপতির দীর্ঘ বক্তৃতাতেও সুভাষ বললেন তাঁর স্বপ্নের কথা

দেশকে গড়ে তোলার জন্য তাঁর স্বপ্ন আর পরিকল্পনার কথা। এক সুভাষই বুঝেছিলেন স্বাধীনতাই শেষ কথা নয়, ক্ষমতা ইংরেজের হাত থেকে দেশি লোকের হাতে এলে সব সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে না। পরে সুভাষ বলবেন, 'তুমি আমাকে রক্ত দাও, আমি তোমাকে স্বাধীনতা এনে দেব।' কিন্তু তিনি জানতেন স্বাধীনতারও পরের কথা আছে।

সে হল দেশকে গড়ে তোলার কথা। এ কথাই রবীন্দ্রনাথ বারবার বলেছেন স্বদেশি যুগে, এই কাজেই সফল হয়েছিল সোভিয়েত রাশিয়া। সুভাষ চেয়েছিলেন আর-একটু সময়, যাতে কংগ্রেসের বিশাল সংগঠনকে কাজে লাগিয়ে দেশ গড়ার স্বপ্নের একটা শক্ত কাঠামো তৈরি করা যায়। রবীন্দ্রনাথ গান্ধিজিকে লিখলেন, সুভাষকে আবার কংগ্রেস সভাপতি করা হোক। গান্ধিজি বিশেষ উৎসাহ দেখালেন না। বরং একজন অনুগামীকে লিখলেন 'এবারে কংগ্রেসের সভাপতি নির্বাচন নিয়ে গণ্ডগোল হবে বলে মনে হচ্ছে।'

গণ্ডগোল সত্যই হল। সুভাষ নিজে যেই প্রার্থী হলেন, তখনই কংগ্রেসের ওয়ার্কিং কমিটি ড. পট্টভি সীতারামাইয়াকে কংগ্রেসের সরকারি প্রার্থী হিসেবে দাঁড় করিয়ে দিল। গান্ধিজির তাই ইচ্ছা, একথা ঘোষণা করলেন সরদার বল্লভভাই প্যাটেল।

২৯ জানুয়ারি ১৯৩৯ তারিখে সারা দেশ এক আশ্চর্য ঘটনা দেখে অবাক হয়ে গেল। মধ্য প্রদেশের ত্রিপুরীতে কংগ্রেসের ৫২তম অধিবেশনে সুভাষ পেলেন ১৫৮০ ভোট, সীতারামাইয়া ১৩৭৫ ভোট। বিষণ্ন গান্ধিজি বললেন, 'সীতারামাইয়ার হার আমারই হার'। এ কথা হয়তো না বললেই ভালো হত। দুবার সভাপতি এর আগে জওহরলাল হয়েছিলেন। গান্ধিজি এবারও তাঁকে ইঙ্গিত দিয়েছিলেন, ইচ্ছে করলে তিনি সুভাষের বিরুদ্ধে দাঁড়াতে পারেন। তিনি নিজে ত্রিপুরীতে এলেনই না।

সুভাষকে বিপদে ফেলার প্রথম ধাপ হল কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির সব সদস্যের এক সঙ্গে পদত্যাগ। গান্ধিজির নির্দেশে। গান্ধিজি বললেন, 'সুভাষেরই সুবিধে হবে এতে, তিনি নিজের পছন্দমতো লোক নিয়ে নতুন ওয়ার্কিং কমিটি তৈরি করতে পারবেন।' সুভাষ জানতেন এ

কথার অর্থ কী? তিনি দুঃখিত হয়ে বললেন, 'ভারতের শ্রেষ্ঠতম মানুষটির বিশ্বাস যদি না পাই, অন্যদের আস্থা দিয়ে আমার কী হবে?'

সুভাষের শরীর আবার ভাঙছিল, মনও ভেঙে গেল। বিহারের স্বাস্থ্যকেন্দ্র জিয়ালগোড়া থেকে প্রচুর চিঠি লিখলেন জওহরলাল আর গান্ধিজিকে, কিন্তু তাঁদের সহানুভূতি তাঁর দিকে এগিয়ে এল না। নেহরু লিখলেন, গান্ধিজিকে পরিত্যাগ করে সুভাষের সঙ্গে চলা তাঁর পক্ষে সম্ভব নয়। সুভাষ চান, সেই মুহূর্তেই ব্রিটিশ-বিরোধী সংগ্রামে কংগ্রেস নেমে পড়ুক, কিন্তু গান্ধিজি তা চান না। বিদেশিদের বিরুদ্ধে হিংসার যুদ্ধে, অস্ত্র লড়াইয়ে সুভাষের আপত্তি নেই, গান্ধিজি অহিংসার পথ ছেড়ে এক চুলও সরবেন না। ফলে দুয়ের পথ আলাদা হয়ে গেল এবার।

৩ মে ১৯৩৯ সুভাষ কংগ্রেসের মধ্যেই তৈরি করলেন তাঁর নিজের দল, নাম দিলেন ফরোয়ার্ড ব্লক। বললেন সমস্ত সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী সংগ্রামী পথকে একত্র করার জন্য এই দল। পাটনায় ক্রুদ্ধ গান্ধিবাদীদের একটি দল তাঁর দিকে জুতো আর পাথর ছুঁড়ল। আর সবচেয়ে বড়ো আঘাত এল যখন গান্ধিজি তাঁকে বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির সভাপতির পদ থেকে সরিয়ে নিলেন। কংগ্রেসকর্মী হিসেবে সুভাষের ভোটে দাঁড়াবার অধিকারও কেড়ে নিলেন। কংগ্রেসের মধ্যে সুভাষ শুধু একঘরে নয়, যেন অচ্ছুত হয়ে গেলেন।

আশ্চর্য এই যে, রবীন্দ্রনাথের কাছ থেকে কিন্তু উৎসাহ আর সমর্থন এসে পৌঁছাল সুভাষের জন্য। তিনি এর আগেও গান্ধিজি আর জওহরলালকে লিখেছিলেন, দ্বিতীয়বারের জন্য সভাপতি হিসেবে সুভাষকে মেনে নিতে। গান্ধিজি মেনে নিতে পারেননি। বলেছিলেন, 'সুভাষ বাড়ির বখে-যাওয়া ছেলের মতো ব্যবহার করছে। সে আমারও ছেলের মতো, তার বিরুদ্ধে কারও ব্যক্তিগত রাগ নেই। কিন্তু কংগ্রেসের বিষয়টা অত্যন্ত জটিল, গুরুদেব সবটা বুঝে উঠতে পারবেন না।'

তবুও রবীন্দ্রনাথ লিখলেন—

"সুভাষচন্দ্র,

বাঙালি কবি আমি, বাংলাদেশের হয়ে তোমাকে দেশনায়কের পদে বরণ করি। গীতায় বলেন, সুকৃতের রক্ষা ও দুষ্কৃতের বিনাশের জন্য

রক্ষাকর্তা বারংবার আবির্ভূত হন। দুর্গতির জালে রাষ্ট্র যখন জড়িত হয় তখনই পীড়িত দেশের অন্তর্বেদনায় আর্বিভূত হয় দেশের অধিনায়ক।...

আজ তুমি যে আলোকে প্রকাশিত তাতে সংশয়ের আবিলতা আর নেই, মধ্যদিনে তোমার পরিচয় সুস্পষ্ট। বহু অভিজ্ঞতাকে আত্মসাৎ করেছে তোমার জীবন, কর্তব্যক্ষেত্রে দেখলুম তোমার যে পরিণতি তার থেকে পেয়েছি তোমার প্রবল জীবনীশক্তির প্রমাণ! এই শক্তির কঠিন পরীক্ষা হয়েছে কারাদুঃখে, নির্বাসনে, দুঃসাধ্য রোগের আক্রমণে, কিছুতেই তোমাকে অভিভূত করেনি; তোমার চিত্তকে করেছে প্রসারিত, তোমার দৃষ্টিকে নিয়ে গেছে দেশের সীমা অতিক্রম করে ইতিহাসের দূর বিস্তৃত ক্ষেত্রে। দুঃখকে তুমি করে তুলেছ সুযোগ, বিঘ্নকে করেছ সোপান। সে সম্ভব হয়েছে, যেহেতু কোনো পরাভবকে তুমি সত্য বলে মানোনি।...হিংস্র দুঃসময়ের পিঠের উপর চড়েই বিভীষিকার পথ উত্তীর্ণ হতে হবে। এই দুঃসাহসিক অভিযানে উৎসাহ দিতে পারবে তুমি, এই আশা করে তোমাকে আমাদের যাত্রানেতার পদে আহ্বান করি।"

আমরা জানি, সুভাষের সারা জীবনের কাজে রবীন্দ্রনাথের প্রত্যেকটি কথা জ্বলন্ত সত্যের রূপ পেয়েছিল।

আট

১৯৩৯-এর ১ সেপ্টেম্বর ভোরবেলা জার্মানবাহিনী পোলান্ড আক্রমণ করল। শুরু হয়ে গেল দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ। একদিকে জার্মানি, পরে যার সঙ্গে যোগ দেবে ইতালি আর জাপান—এরা হল অক্ষশক্তি। এদের বিরুদ্ধে দাঁড়াবে মিত্রপক্ষ— ইংল্যান্ড আর ফ্রান্স, কিছু পরে রাশিয়া, আর শেষ দিকে আমেরিকা।

ইংল্যান্ড বিপদ দেখে ভারতের নেতাদের সাহায্য চাইল যুদ্ধে, কিন্তু ভারতের স্বাধীনতার কথাটা এড়িয়ে গেল। কংগ্রেসের সরকারি দলও তেমন করে চেপে ধরতে চাইল না ইংরেজ সরকারকে। ভাবটা যেন এই, 'আহা, এখন ব্রিটিশ সিংহ বিপদে পড়েছে, আমরা আর বেচারাকে ঝামেলাতে নাই-বা ফেললাম।' তা ছাড়া নীতির দিক থেকেও গান্ধি-নেহরুরা ভেবেছিলেন, এ যুদ্ধে ইংল্যান্ডই ন্যায়ের পক্ষে, জার্মানরা পোলান্ড আক্রমণ করে অন্যায় করেছে।

মাদ্রাজের উপকূলে বিশাল এক জনসভায় ৩ সেপ্টেম্বর ভাষণ দিচ্ছিলেন সুভাষচন্দ্র, এমন সময় তাঁর কাছে যুদ্ধের সংবাদ পৌঁছোল। তিনি লাফিয়ে উঠলেন, বললেন, 'এই হল সুযোগ। এবার ব্রিটিশদের চাপ দিয়ে ভারতের স্বাধীনতার প্রতিশ্রুতি আদায় করে নেওয়া চাই। কোনো আপোষ নয়। ব্রিটিশদের অধীনে যুক্তরাষ্ট্রও (ডোমিনিয়ন স্টেটাস) আমরা চাই না। চাই স্বাধীন সার্বভৌম ভারতবর্ষ, যে নিজের ভাগ্য নিজেই পরিচালনা করবে। কারও খবরদারি চাই না আর।'

কংগ্রেসের সরকারি দল তাঁর কথায় কান দিল না। এখন স্বাধীনতার কথা তোলা মানে ইংরেজদের খামোখা বিরক্ত করা। যুদ্ধটা আগে শেষ হোক, তারপর সুবিধেমতন কথাটা পাড়া যাবে— যেন এইরকম ভাবছিল তারা।

এবার ব্রিটিশদের চাপ দিয়ে ভারতের স্বাধীনতার প্রতিশ্রুতি আদায় করে নেওয়া চাই

সুভাষ দেখলেন, এরা যেন আরামের গণ্ডি ছেড়ে কেউ বেরোতে চায় না। নানা জায়গায় কংগ্রেস দল সরকারে ঢুকে পড়েছে, মন্ত্রিত্ব নিয়েছে। এখন ইংরেজের সঙ্গে লড়াইয়ের ইচ্ছে নেই, দরকষাকষিতেও ভয়। ছাত্রদের একটি সভায় সুভাষ বললেন (১৯৪০), 'এরাই কি দেশের নেতা? কোথায় এখন দেশের স্বাধীনতার লড়াইয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ব, তা নয় গদি ধরে বসে আছি। আমার মনে পড়ছে এক ইতালিয়ান সেনাপতির সেই সব জ্বলন্ত কথাগুলো— আমি তোমাদের দেব ক্ষুধা, তৃষ্ণা, নিঃসঙ্গতা, তোমাদের বাধ্য করব অভিযানে, তোমাদের ঠেলে দেব মৃত্যুর মুখে। এসো, তোমরা আমাকে অনুসরণ করো।'

দেশের নেতারা সুভাষের ডাক কানেই তুলল না। তারা বড়ো কোনো আন্দোলন গড়ে তুলতেই চাইল না। সুভাষই গড়ে তুললেন এক আন্দোলন।

পলাশির যুদ্ধের আগে সিরাজউদ্‌দৌল্লা একবার কলকাতা আক্রমণ করেছিলেন। তখন নাকি একটা বন্ধ ঘরে একগাদা ইংরেজকে ঠেসে ভরে তাদের হাওয়া-বাতাস বন্ধ করে তিনি মেরে ফেলেছিলেন। এরই নাম 'অন্ধকূপ হত্যা'। ভারতীয় ঐতিহাসিকেরা বলেন এটা ইংরেজদের মিথ্যা রটনা, অন্ধকূপ হত্যা আদৌ ঘটেনি। তবু ইংরেজরা ডালহৌসি স্কোয়ারে এ ঘটনার স্মরণে একটা স্মৃতিস্তম্ভ খাড়া করেছিল, তার নাম দিয়েছিল হল্‌ওয়েল্‌ বলে এক সাহেবের নামে। সুভাষ বললেন, এই হলওয়েল্‌ স্মৃতিস্তম্ভ ইতিহাসের মিথ্যাবাদী সাক্ষী, একে সরাতে হবে। হাজার হাজার হিন্দু-মুসলমান স্বেচ্ছাসেবক তৈরি হল, কলকাতার বুক থেকে ওই মিথ্যা কলঙ্কের বোঝা ছুঁড়ে ফেলে দিতে হবে।

যেদিন আন্দোলন শুরু হবে, ৩ জুলাই, ১৯৪০, সেদিনই ব্রিটিশ সরকার সচল হল, সুভাষকে গ্রেপ্তার করে নিয়ে তুলল সেই প্রেসিডেন্সি জেলে। স্মৃতিস্তম্ভ অবশ্যি পরে তুলে ফেলা হল, আন্দোলনও বন্ধ হল। অনেককেই ছেড়ে দেওয়া হল। কিন্তু সুভাষকে জেল থেকে ছাড়া হল না আর জেলে থাকতেই ঢাকা থেকে কেন্দ্রীয় আইনসভায় প্রতিনিধি নির্বাচিত হলেন তিনি। সুভাষ সম্বন্ধে কোনো খবর যাতে কাগজে না বেরোয় সরকার সে জন্যে ইংরেজ সরকার কাগজগুলোকে বারণ করে

দিল। দাদা শরৎচন্দ্র বাংলার আইন বিরোধীপক্ষের নেতা ছিলেন, ঠাট্টা করলেন, 'সরকার সুভাষকে বেশ ভয় পাচ্ছেন মনে হচ্ছে।'

সরকার একটু ভয় পেল সম্ভবত, যখন সুভাষ জেলে জানালেন, ২৯ নভেম্বর থেকে তিনি জেলে অনশন আরম্ভ করবেন। সুভাষ বললেন সরকারকে, 'আয়ার্ল্যান্ডের বিপ্লবী টেরেন্স ম্যাকসুইনি আর আমাদের বিপ্লবী যতীন দাসের আত্মত্যাগ আমার চোখের সামনে ভাসছে। দীর্ঘ অনশন করে তাঁরা দেশের জন্য জীবন বিসর্জন দিয়েছিলেন।... আমাকে আপনারা যদি না ছাড়েন তাহলে আমি ওই মৃত্যুর পথ বেছে নেব। বাঁচব না মরব, সে সিদ্ধান্ত সম্পূর্ণ আমার, যেখানে আপনাদের জোর খাটবে না। আমার মৃত্যুর বিনিময়ে ভারত বাঁচবে, তার স্বাধীনতা আসবে, গৌরব অর্জিত হবে।'

সরকার একটু ঘাবড়ে গিয়ে ছেড়েই দিল সুভাষকে (৫ ডিসেম্বর, ১৯৪০)। ভাবল, ছেলেটা একটু সুস্থ হলেই আবার ধরে এনে তুলব জেলে। কদিন বাড়িতে খেয়ে দেয়ে শরীরটা একটু সারিয়ে নিক।

সেই সুযোগ অবশ্য সরকারের হয়নি আর। মাসখানেকের ক-দিন পরে ১৯৪১-এর ১৬ জানুয়ারি এমন একটা ঘটনা ঘটল যাতে সুভাষ চিরকালের মতো চলে গেলেন ব্রিটিশ সরকারের জেল থেকে অনেক দূরে। আর কোনোদিন ব্রিটিশ সরকার তাঁর হাতে হাতকড়া পরাতে পারবে না। সে এক আশ্চর্য ঘটনা, ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে তার তুলনা নেই। সারা পৃথিবীর বিপ্লবের ইতিহাসেও তার তুলনা আছে কি না সন্দেহ। কোনো বাঙালি সন্তানের পক্ষে এমন যে সম্ভব, এমনকি কোনো মানুষের পক্ষে— তা কে ভাবতে পেরেছিল? সেই আশ্চর্য ঘটনার কথা বলি এবার।

নয়

প্রেসিডেন্সি জেলে বসেই সুভাষ ভেবেছিলেন, এই যুদ্ধে ব্রিটিশ সিংহ বিপাকে পড়েছে, এর সুযোগ না নিতে পারলে আর সুযোগ পাওয়া যাবে কি না সন্দেহ। কংগ্রেসের আর সব নেতারা যখন বসে হিসেব কষছে আর ভালোমানুষি দেখাচ্ছে, তখন তাঁকেই ভাবতে হবে সামনাসামনি যুদ্ধের কথা। সৈন্যদল তৈরি করে, অস্ত্রশস্ত্র ট্যাঙ্ক কামান নিয়ে। তার জন্য যুদ্ধে দক্ষ জাতির সাহায্য দরকার, ইংরেজের শত্রুদের কাছে সে সাহায্য চাইতে হবে। এ জন্য আর-একবার ইয়োরোপে, জার্মানিতে যাওয়া চাই। কিন্তু সরকার যে এখন দেশ ছেড়ে যেতে দেবে না, সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই।

তাহলে কী করা? একমাত্র রাস্তা গোপনে, লুকিয়ে ছদ্মবেশে দেশ ছেড়ে যাওয়া। গল্পে উপন্যাসে এরকম পড়ি বটে আমরা, আর পড়ি নানা দেশের বিপ্লবের ইতিহাসে। কিন্তু আমাদেরই দেশের একজন মানুষ এই দারুণ দুঃসাহসের কাজে ঝাঁপিয়ে পড়বেন, তা দেশে কেন, পৃথিবীতেও কেউ ভাবতে পারেনি।

সে যেন এক রহস্য উপন্যাসের মতো। ২৭ জানুয়ারি সকালে সারা দেশ শুনে স্তম্ভিত হয়ে গেল যে, সুভাষ বাড়ি থেকে কোথায় চলে গেছেন কেউ জানে না। পুলিশ সে কথা শুনে ছুটল তাঁর এলগিন রোডের বাড়িতে। সেখানে গিয়ে দেখল বাড়ির লোকও শোকাচ্ছন্ন হয়ে বসে আছে, কেউ কিছু বলতে পারছে না। অনেক কষ্টে যা জানা গেল তা হল এই যে গত দশ-বারো দিন ধরে নির্জনে যোগ আর ধ্যান করছিলেন সুভাষ। সে সময় কেউ যেন তাঁর ঘরে না যায়, এই ছিল তার হুকুম। পর্দার পিছনে তিনি আসন করতেন, পর্দার এ পাশে খাবার রেখে আসত ভাইপো অরবিন্দ। ২৫শে সকালে দুধ আর ফল রেখে গিয়েছিল সে।

২৬শে গিয়ে দেখা গেল সে দুধ আর ফল যেমন ছিল তেমনই আছে। উদ্‌বিগ্ন হয়ে অরবিন্দ পর্দা সরিয়ে দেখে তার পিছনে কেউ নেই।

পুলিশের সন্দেহ হল, কিন্তু তারা ভাবল, কী জানি ছেলেবেলায় একবার সন্ন্যাসী হতে গিয়েছিল যে-লোকটা, হয়তো এবারে সত্যি-সত্যি সে সংসার ছাড়ল। আবার কেউ বলল, দেখলাম যেন হংকং-এর জাহাজ ধরলেন— তাহলে কি জাপানের দিকে গেলেন?

আসলে সুভাষ আর তার পরিবার সরকারের পুলিশকে বিশ্রী বোকা বানালেন এবার। পুলিশ ধরতেই পারল না যে সুভাষ বাড়ি ছেড়েছেন দশ দিন হল। আর হিমালয়ের গুহার দিকে তিনি ছোটেননি। জাপানেরও নয়। গেছেন ভারতের উত্তর-পশ্চিম সীমানা পেরিয়ে আফগানিস্তানে। আফগানিস্তান থেকে রাশিয়া হয়ে জার্মানিতে পৌঁছোবেন— এই তার পরিকল্পনা। ১৯ তারিখেই পেশাওয়ার পৌঁছে গেছেন সুভাষ। পুলিশ এ দশ-এগারো দিন ঘূণাক্ষরেও বুঝতে পারেনি সুভাষ বাড়িতে নেই, চলে গেছেন একেবারে তাদের নাগালের বাইরে।

কীভাবে এই অবিশ্বাস্য কাণ্ডটা ঘটিয়ে তুললেন সুভাষ? আসলে পরিকল্পনাটা করা হয়েছিল বেশ কিছু দিন ধরে। তিন ভাইপো শিশির, দ্বিজেন আর অরবিন্দ ছিল তাঁর ষড়যন্ত্রের সঙ্গী। ঠিক হয়েছিল, ১৬ জানুয়ারি রাত বারোটার পরে দ্বিজেন লক্ষ করবে পুলিশের টিকটিকিরা ঘুমিয়ে পড়েছে কি না। সে ইশারা করলে শিশির গাড়ি নিয়ে আসবে।

গাড়ি নিঃশব্দে এসে দাঁড়াল গাড়িবারান্দার নিচে। মালপত্র তোলা হল, সুভাষও নিঃশব্দে উঠে গেলেন। দরজা বন্ধের একটু শব্দ হল, কিন্তু পুলিশ কিছু বুঝতে পারল না। গাড়ি পুলিশকে বোকা বানানোর জন্য প্রথমে দক্ষিণে গেল একটু। তারপর ল্যান্সডাউন রোডে (এখন শরৎ বসু রোডে) পড়ে সোজা উত্তর দিকে। তারপর কলকাতা থেকে বেরিয়ে গ্র্যান্ড ট্রাঙ্ক রোড ধরে এক রাতে দুশো মাইল দৌড়। সকালবেলায় ধানবাদের কাছে বারারিতে শিশিরের বড়দা অশোক বসুর বাংলোতে পৌঁছে গেলেন গাড়ি নিয়ে একা শিশির। পলাতক সুভাষ কিছু আগে নেমে গিয়েছিলেন, একটু পরে তিনি হেঁটে এসে বাংলোতে ঢুকলেন।

অশোক আগেই জানতেন। দেখলেন, সুভাষ পরেছেন ঘন খয়েরি রঙের শেরোয়ানি, ঢিলে পাজামা, ফিতে-ওয়ালা মজবুত জুতো, আর

কালো পশুর লোমওয়ালা টুপি। ছদ্মবেশ দেখে তিনি অবাক, এতো তাঁদের রাঙাকাকা নন! কে ইনি? শিশির হেসে বলল, ইনি মহম্মদ জিয়াউদ্দিন, ইনশিয়োরেন্স কোম্পানির এজেন্ট। তাঁর সুটকেশ বিছানা সব কিছুর উপরেই বড়ো করে লেখা ছিল M. Z. অর্থাৎ মহম্মদ জিয়াউদ্দিনের ইংরেজি প্রথম বর্ণ। শিশির অশোককে ইংরেজিতে বললেন, 'আমার এই বন্ধুকে এক দিনের জন্য আশ্রয় দিতে হবে।' অশোক বললেন, 'অবশ্যই'। তারপর সকলে মিলে সেই রাত্রেই দিল্লি কালকা মেলের একটি প্রথম শ্রেণির কামরায় তুলে দিলেন 'মহম্মদ জিয়াউদ্দিন'-কে। এই ভাইপোদের সঙ্গে আর কখনও দেখা হবে না তাদের রাঙাকাকার।

দিল্লি থেকে ফ্রন্টিয়ার মেল ধরে ১৯ জানুয়ারি পেশাওয়ার পৌঁছোলেন সুভাষ! সেখানে ফরওয়ার্ড ব্লকের নেতা মিঞা আকবর শাহ তাঁকে ট্রেন থেকে নামিয়ে নিলেন। প্রথমে একটি হোটেলে, তারপর আর-এক বন্ধু আবাদ খানের বাড়িতে ছ-দিন থেকে, শুরু হল তাঁর কাবুল যাত্রা।

এ যাত্রা সহজ ছিল না। পাহাড়ের সরু রাস্তায় চড়াই-উতরাই পার হয়ে, কখনও হেঁটে, কখনও ঘোড়ায়, কখনও চায়ের পেটি ভর্তি ট্রাকে উঠে চলল তাঁর যাত্রা। বেশির ভাগই হেঁটে। এ যাত্রায় তাঁর সঙ্গী সিন্ধি যুবক ভগতরাম তলোয়ার, আর মহম্মদ শাহ। বরফে ঘোড়ায় পা পিছলে একবার সুভাষ পড়েও গিয়েছিলেন ঘোড়া থেকে। শেষে ২৮ জানুয়ারি তাঁরা পৌঁছোলেন জালালাবাদ। তখন কলকাতায়, ভারতে হইচই পড়ে গেছে সুভাষের অন্তর্ধান নিয়ে।

জালালাবাদ থেকে টাঙ্গায় কাবুল— ৩১ জানুয়ারি সকাল ১১ টায়।

কাবুলে ছদ্মবেশ বদল করতে হল। ছিলেন উত্তর প্রদেশের মুসলমান, এবার সাজলেন রীতিমতো পাঠান। আমরা যাকে বলি কাবুলিওয়ালা। কিন্তু কাবুলের ভাষা পশতু জানেন না তো। কথা বললেই যদি লোকে ধরে ফেলে? তাই এবার হলেন বোবা আর কালা দুইই। কথাও বলতে পারেন না, কানেও শোনেন না কিছু।

সুভাষচন্দ্রের পরিকল্পনা ছিল, যত তাড়াতাড়ি সম্ভব আফগানিস্তান ছেড়ে ইয়োরোপে পাড়ি দেওয়া যায়। কারণ যে সরাইয়ে আছেন

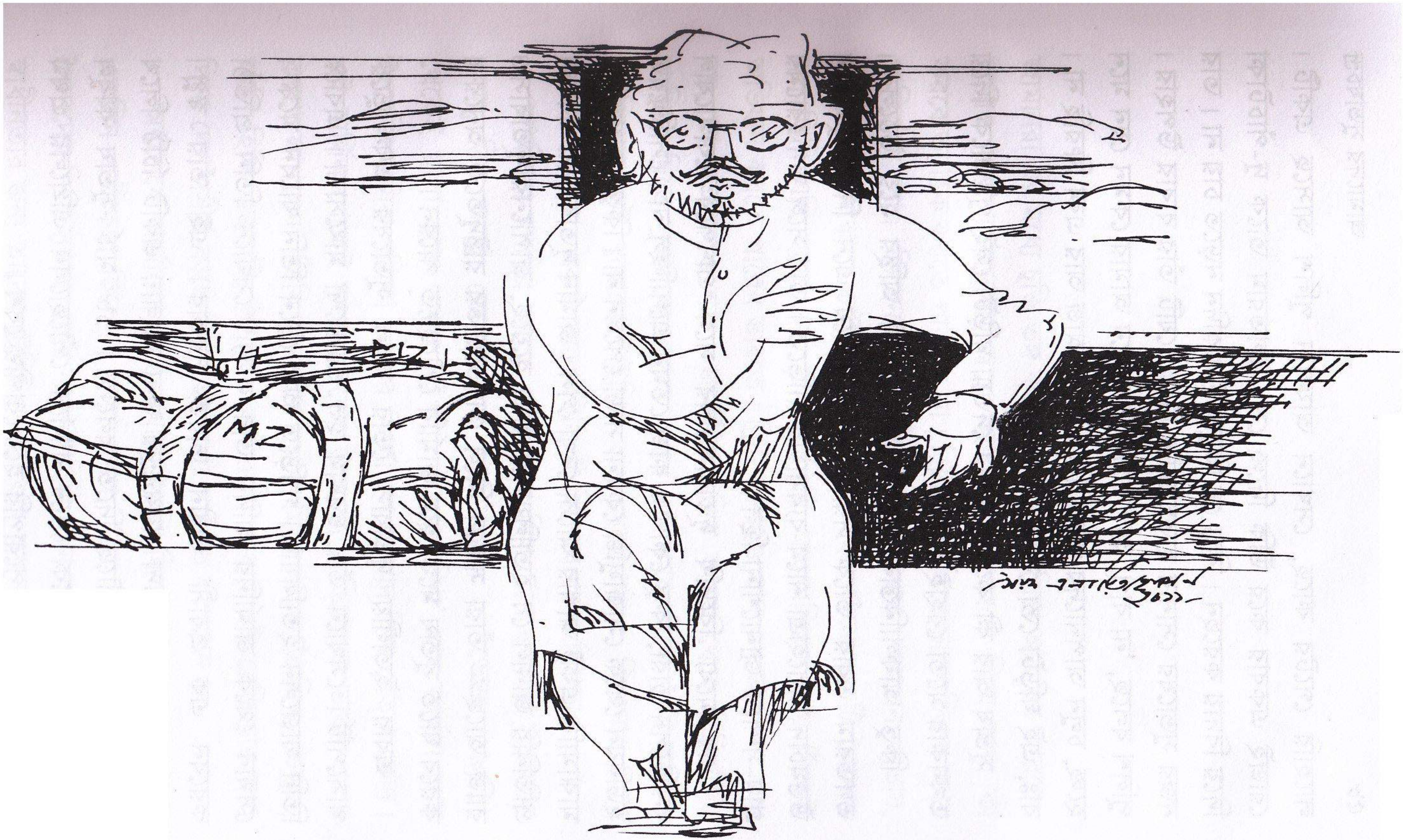

সেই রাত্রেই দিল্লি কালকা মেলের একটি প্রথম শ্রেণির কামরায় তুলে দিলেন 'মহম্মদ জিয়াউদ্দিন'-কে

লাহোরি গেটের কাছে, সেখানে আফগান পুলিশ আসছে একটি। রোজই একবার করে উঁকি দিচ্ছে সে। ভগতরাম তাকে দু-পাঁচটাকা দিয়ে বিদায় করছেন। কিন্তু সে কিছুতেই একদিন নড়তে চায় না। তার নজর সুভাষের সোনার হাতঘড়িটির দিকে, যেটি তাঁর বাবার উপহার। পুলিশ বলছে, 'না বাপু, আপনাদের চালচলনে আমার কেমন যেন মনে হচ্ছে, চলুন আপনাদের থানায় নিয়ে যাই। আজ আর একা ফিরছি না। বাঃ, এই ঘড়িটা তো বেশ!'

সুভাষ আর কী করেন, বাবার দেওয়া ঘড়িটা সেই পুলিশকে দিয়ে তখনকার মতো রেহাই পেলেন।

কিন্তু আফগানিস্তান ছাড়বার জন্য তিনি অস্থির হয়ে উঠলেন। ভগতরাম এবার তাঁকে সরাই থেকে সরিয়ে এনে নিয়ে তুললেন উত্তমচাঁদ মালহোত্রা নামে ব্যবসায়ীর বাড়িতে। তাঁর সঙ্গে ভগতরামের গ্রাম-সম্পর্কে জানাশোনা ছিল।

এর মধ্যে বিদেশি দূতাবাসগুলির সঙ্গে প্রাণপণে যোগাযোগ করছিলেন তাঁরা, কিন্তু কোথাও কাজ তেমন এগোচ্ছিল না। সোভিয়েত ইউনিয়ন থেকে সোজাসুজি কোনো সাড়া পেলেন না। কিন্তু ফেব্রুয়ারির মাঝামাঝি একটু আশার আলো দেখা গেল। জার্মান দূতাবাসের একজন প্রতিনিধি জানাল যে ইতালিয়ানরা রাজি হয়েছে, জাপানের দূতাবাসও রাজি আছে— তাঁরা সকলে মিলে সোভিয়েতের রাষ্ট্রদূতকে অনুরোধ করবে যাতে সুভাষ মস্কো হয়ে জার্মানি পৌঁছোতে পারেন।

এবার ইতালীয় দূতাবাস তৈরি করল সুভাষের এক ভুয়ো পাসপোর্ট। সেখানে তাঁর ছদ্মনাম হল ওরলান্দো মাৎসোত্তা। এবারে তিনি সাজলেন ইতালিয়ান। গাড়িতে আর ট্রেনে তিনি যাবেন মস্কো। সেখান থেকে জার্মানির বার্লিন তাঁর লক্ষ্য। সেখানে তিনি প্রতিষ্ঠা করবেন এক প্রবাসী স্বাধীন ভারত সরকার। এই তাঁর স্বপ্ন। ভগতরামের কাছে দাদা শরৎচন্দ্রের জন্য বাংলায় একটি চিঠি লিখে সেটি কলকাতায় পৌঁছে দিতে বললেন। ১৮ মার্চ সুভাষ কাবুল ছাড়লেন। মস্কো থেকে প্লেনে বার্লিনে পৌঁছোলেন এপ্রিলের প্রথম সপ্তাহে। এবারে তাঁর পুরোপুরি ইয়োরোপীয় বেশ।

দশ

জার্মানরা এর মধ্যে চুক্তি ভঙ্গ করে সোভিয়েত রাশিয়া আক্রমণ করেছে। তারাও সাম্রাজ্য বাড়াবার স্বপ্নে আত্মহারা। সুভাষকে নিয়ে তারা কী করবে তা ঠিক করতে পারছিল না। হিটলার এ নিয়ে ভাবনাচিন্তার সময় পাচ্ছিলেন না। ভিয়েনা থেকে বার্লিন যাতায়াত করলেন সুভাষ, জার্মানদের বোঝাতে চাইলেন যে, হাজার পঞ্চাশেকের একটি সৈন্যের দল তিনি যদি হাতে পান তাহলে তিনি আফগানিস্তান হয়ে নিজেই অভিযান করতে পারেন ভারতে। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ শুধু জার্মানির শত্রু নয়, তা সভ্যতারও শত্রু। জার্মানির উচিত ভারত থেকে ব্রিটিশদের তাড়িয়ে দিতে সুভাষকে সাহায্য করা। এই সময় তাঁকে খুবই সাহায্য করছিলেন সেই পুরোনো টাইপিস্ট আর সেক্রেটারি— ভিয়েনার মেয়ে এমিলি শেংক্‌ল। এবার তাকে তিনি স্ত্রী হিসেবে মেনে নিলেন।

জার্মানরা মনস্থির করতে বেশ সময় নিল। শেষে তারা সুভাষকে বলল, ঠিক আছে, তোমার কাজ শুরু করো। ২ নভেম্বর (১৯৪১) থেকেই ছাপা হতে থাকল বইপত্র, 'আজাদ হিন্দ' নাম জার্মান আর ইংরেজি মাসিক পত্রিকা। এবার খোলা হল আজাদ হিন্দ বেতার কেন্দ্র। ওই বার্লিন থেকেই সুভাষ দেশের উদ্দেশ্যে রেডিয়োতে ভাষণ প্রচার করতে লাগলেন। তিনি আর তাঁর সঙ্গীরা মিলে বাংলা, তামিল, তেলুগু, ফার্সি হিন্দি গুজরাটি, পশ্‌তু— নানারকম ভাষায় ওই রেডিয়োর মধ্য দিয়ে দেশবাসীর কাছে বিদ্রোহের বাণী পাঠাতে লাগলেন।

অবশেষে জার্মানরা সেই কথায় সম্মতি দিল— যার জন্য সুভাষ এতদিন প্রতীক্ষায় ছিলেন। তারা বলল, 'ঠিক আছে, বন্দি ভারতীয় সৈন্যদের নিয়ে সুভাষ এবার নতুন বাহিনী গঠন করতে পারেন, দেশের স্বাধীনতার জন্য তাদের ট্রেনিং দেওয়া শুরু করুন তিনি।'

দুটো ক্যাম্পে প্রায় ৩০০০ ভারতীয় সৈন্য ট্রেনিং নিতে লাগল। এ সংখ্যা খুব বড়ো নয়। নানা জায়গায় ইংরেজদের সঙ্গে যুদ্ধে প্রায় পনেরো থেকে সতেরো হাজারের মতো ভারতীয় সৈন্য বন্দি হয়েছিল জার্মানদের হাতে। তাদের বেশির ভাগই এমন রাজভক্ত যে, তারা বলল, 'না আমরা বন্দি হলেও ব্রিটিশ রাজার সৈন্যই থাকব, ও স্বাধীনতায় আমাদের দরকার নেই।' এ রকম কর্তাভজা লোক সব দেশেই থাকে।

যাই হোক, যারা শপথ নিল যে সুভাষচন্দ্রের নেতৃত্বে তারা দেশের স্বাধীনতার জন্য প্রাণ বিসর্জন দেবে, তাদের ট্রেনিং দিতে লাগল জার্মান অফিসারের দল।

এই আজাদ হিন্দ বাহিনীতে সুভাষ প্রথমেই এমন একটা দারুণ কাজ করে ফেললেন যা আজকের দিনেও আমাদের অবাক করে দেয়। তিনি বললেন হিন্দু মুসলমান শিখ— যে যাই হোক না কেন, সকলে একসঙ্গে বসে খাবে। প্রত্যেকের নিজের নিজের মতো খাবার খাবে, কিন্তু তা রাঁধা হবে এক রান্নাঘরে, খেতে হবে এক সঙ্গে বসে। সৈন্যরা সকলে সেই কথা মেনে নিল। হবে না কেন? সুভাষ নিজে যেমন জাত-পাত-ধর্ম নিয়ে ঝগড়াঝাঁটি একদম পছন্দ করতেন না, তিনি বলতেন ভারত দেশটা হিন্দু মুসলমান শিখ খ্রিস্টান সকলের, কারও একার নয়— আর সব ধর্মের মানুষই তাঁকে ভালোবাসত, তাঁকে নেতা হিসেবে মেনে নিত। তোমরা দেখবে, জার্মানিতে তাঁর সঙ্গী আর অনুরাগী সহায়কদের মধ্যেও ছিলেন আবিদ হাসান, হবিবুর রহমান। সাংবাদিক এ. সি নাম্বিয়ার। তাঁর নিজের ডাক্তার ডা. এ ফারুকি।

আর একটা জিনিস হল। আবিদ হাসান তার কথা বলেছেন। সবাই লক্ষ করল যে, সৈন্যরা ধর্ম অনুযায়ী এক দল আর-এক দলকে অভিনন্দন জানায়। মুসলমানরা বলেন, 'সালাম আলেহকুম' (শান্তি আপনার হোক), হিন্দুরা অনেকে বলেন 'নমস্তে' বা 'নমস্কার', রাজপুতরা বলে 'জয় রামজিকি'।। আবিদ ভাবলে, এমন কেন হবে? সবাই বলুক না 'জয় হিন্দুস্তান-কি'; বা সংক্ষেপে 'জয় হিন্দ!' সুভাষ খুব আনন্দের সঙ্গে রাজি হলেন। ব্যাস্, সৈন্যরা— যে যে-ধর্মের হোক না কেন, এবার দেখা হলেই অভিনন্দন জানাত 'জয় হিন্দ' বলে।

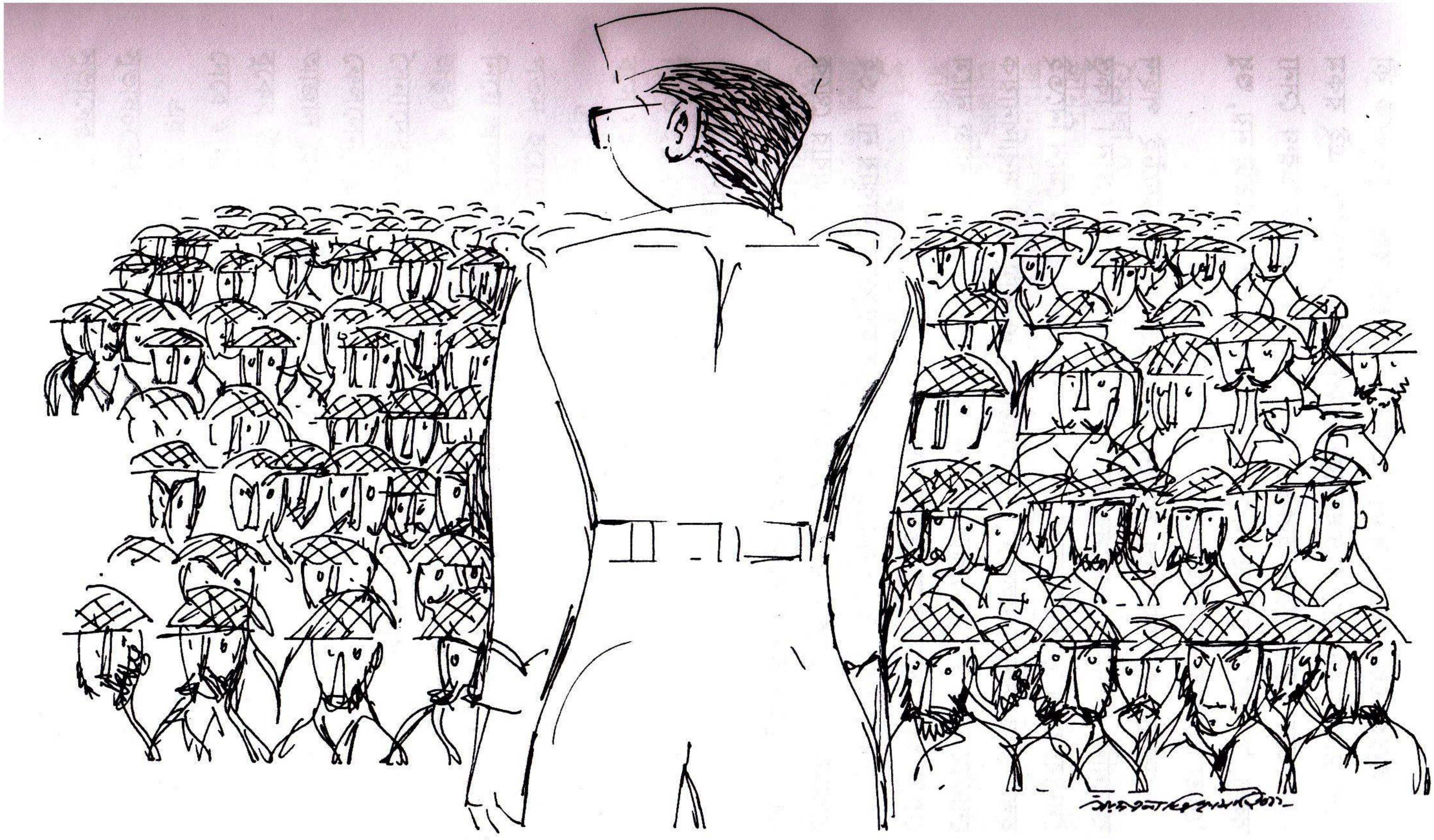

সৈন্যরা সকলে সেই কথা মেনে নিল

আরও একটা ঘটনা ঘটল। একটা নাম তৈরি হল। সুভাষকে কী বলে ডাকবে সৈন্যরা? সুভাষ বাবু? রাষ্ট্রপতিজি? প্রধানজি? এই রকম নানা ডাক নানান জনে ডাকত। শেষে একদিন একটি তরুণ সৈন্য বলল, 'হামারা নেতা'। তখন সুভাষের সঙ্গীরা বললেন, এতটা নয়, শুধু 'নেতাজি' বলে ডাকলেই হবে।

তোমাদের শুনে মজা লাগবে, সুভাষচন্দ্র নিজে মোটেই পছন্দ করেননি এ নাম। সঙ্গীদের কাছে খুব আপত্তি করেছিলেন। কিন্তু সেন্যরা যখন 'নেতাজি' বলে ডাকতে লাগল তখন তাঁকে মেনে নিতেই হল। তাঁর সঙ্গীরা বললেন, কে নেতাজি, এ নাম তো সর্বাধিনায়ক বোঝায় না। যেমন বোঝায় জার্মান 'ফুরার' কথাটায়। নেতাজি নামে যেমন আছে ভালোবাসা তেমনি শ্রদ্ধা।

সেই থেকে নেতাজি বলতে আর কোনো মানুষকে বোঝায় না। ওই একজনই সব দেশের জন্য, সব সময়ের জন্য নেতাজি। এবার থেকে আমরা এ নামটিও ব্যবহার করব।

এগারো

সৈন্যরা তো চমৎকার তৈরি হচ্ছে, কিন্তু যুদ্ধ হবে কোথায়, কার সঙ্গে? জার্মানরা অবশ্য নানা দেশের সঙ্গে লড়াই করছে, কিন্তু নেতাজি তো জার্মানদের যুদ্ধ লড়বেন না, তাঁর সৈন্যরাও জার্মানদের অধীন হবে না। আজাদ হিন্দ ফউজ লড়াই করবে হিন্দ বা ভারতের আজাদির জন্য, স্বাধীনতার জন্য। কিন্তু ওই দু-তিন হাজার সৈন্য নিয়ে জার্মানি থেকে পূর্ব দক্ষিণে হাজার হাজার মাইল নদী পাহাড় সমুদ্র পার হয়ে ভারতে গিয়ে লড়াই করা— সে এক অলীক আর অবাস্তব স্বপ্ন। সুভাষচন্দ্র উপায় ভাবতে লাগলেন, কী করে ব্রিটিশ সৈন্যের সঙ্গে মুখোমুখি লড়াইয়ে নামা যায়, কীভাবে বিজয়ী এক বাহিনী নিয়ে ভারতের মাটিতে পা রাখা যায়। এই কাজে যদি শরীরের শেষ রক্তবিন্দু ধুলোতে মিশিয়ে দিতে হয় সেও ভালো। তবু, পরাধীন জন্মভূমি থেকে এই এত দূরে বসে যুদ্ধ যুদ্ধ খেলা আর ভালো লাগছে না।

এর মধ্যে খবর পেলেন জাপানি বাহিনীর আক্রমণে সিঙ্গাপুরের পতন হয়েছে, সেখানকার ব্রিটিশ সৈন্যদলকে তাড়িয়ে পশ্চিমদিকে নিয়ে আসছে জাপানের সৈন্যদল। ব্রিটিশ সিংহ শিকারির তাড়া খাওয়া জন্তুর মতো ল্যাজ গুটিয়ে পালিয়ে আসছে। জাপানের সুশৃঙ্খল দুর্ধর্ষ সৈন্যদের কাছে তারা দাঁড়াতেই পারছে না। সুভাষ সঙ্গে সঙ্গে স্থির করে ফেললেন, ওই পূর্ব এশিয়া হবে তাঁর রণক্ষেত্র— সেখান থেকেই তাঁর আজাদ হিন্দ ফউজ ইংরেজ বাহিনীর পেছনে ধাওয়া করবে, দেশের বুকের উপর থেকে তাদের তাড়িয়ে দিয়ে দিল্লির লাল কেল্লায় উড়িয়ে দেবে স্বাধীনতার বিজয় নিশান।

এর মধ্যে ১৯৪২-এর মে মাসের শেষ দিকে হিটলার আর সুভাষচন্দ্রের দেখা হওয়ার সুযোগ হল। হিটলার অনেক কিছু বললেন, সুভাষের মনে হল লোকটির কথাবার্তা একটু ভাসা-ভাসা। সুভাষ

জিজ্ঞেস করলেন 'আপনার আত্মজীবনীতে ভারতীয়দের সম্বন্ধে এমন অবজ্ঞা কেন?' হিটলার উত্তর দিলেন না, তবে বললেন, 'আপনি যদি জাপান যেতে চান তার ব্যবস্থা হবে। আর ভারত স্বাধীন হলে আমরা নিশ্চয়ই সাহায্য করব।' হিটলারের মুরুব্বি-মুরুব্বি ভাব খুব একটা ভালো লাগল না সুভাষের। কাজেই এখন সুভাষকে জাপানে যেতেই হবে, গিয়ে সেখানকার রাষ্ট্রনায়ক আর সেনাপতিদের সঙ্গে কথা বলে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার যুদ্ধক্ষেত্রে আজাদ হিন্দ ফউজের আবির্ভাবের ব্যবস্থা পাকা করতেই হবে।

কিন্তু পুবে-পশ্চিমে সর্বত্রই যুদ্ধ চলছে— আকাশে যুদ্ধ, জলে যুদ্ধ, স্থলে যুদ্ধ। স্থলপথে যাওয়ার প্রশ্নই ওঠে না। আকাশে মিত্রশক্তি, এমনকি আমেরিকার বোমারু বিমান টহল দিচ্ছে। জলে ভাসছে তাদের অসংখ্য যুদ্ধজাহাজ। এই অবস্থায় পৃথিবীর পশ্চিম প্রান্ত থেকে পুব প্রান্তে পৌঁছোবেন কী করে সুভাষচন্দ্র?

এই নিয়ে জার্মানি আর জাপান সরকারের সঙ্গে অনেকদিন ধরে কথাবার্তা চলল। নেতাজি চাইছিলেন, যেহেতু সমুদ্রের তলা দিয়ে যাত্রাই একমাত্র পথ খোলা রয়েছে, তাহলে এই দুই সরকার ব্যবস্থা করুক একটা সাবমেরিনের। ওই ডুবোজাহাজে করেই ইয়োরোপ থেকে এশিয়ার পুব প্রান্তে পৌঁছোবেন নেতাজি। বার্লিন থেকে তোকিয়োতে। এমন যাত্রা ভয়ংকর এক বিপদের যাত্রা। কখন সমুদ্রের তলায় শত্রুদের জাহাজ টরপেডো ছুঁড়ে বা 'ডেপ্‌থ চার্জ' করে ডুবোজাহাজ ঘায়েল করে দেয়, কখন সেটা টুকরো টুকরো হয়ে সমুদ্রের তলায় গিয়ে পৌঁছায়, কে জানে? সুভাষ জানতেন, গভীর সমুদ্রের পেটের মধ্যে তলিয়ে যাওয়ার সম্ভাবনাই বেশি। তবু তাঁকে কে আটকাবে? বারবার তিনি এই নিশ্চিত মৃত্যুর দিকে এগিয়ে গেছেন, আর মৃত্যু যেন ভয় পেয়ে পেছনে সরে গেছে।

এবারও তাই হল। ফেব্রুয়ারির গোড়ায় জাপানি কর্তৃপক্ষের অনুমোদন এসে পৌঁছোল। হ্যাঁ, সাবমেরিনেই নেতাজিকে নিয়ে যাওয়া হবে। তবে একটাতে নয়। কিছুদূর পর্যন্ত তাঁকে পৌঁছে দেবে জার্মান সাবমেরিন, তারপর একটি জাপানি সাবমেরিনে তাঁকে তোলা হবে। নেতাজিকে বলা হল, 'দেখুন, এ যাত্রা কিন্তু আপনার নিজের দায়িত্বে, আপনি যে পৌঁছোবেনই সে প্রতিশ্রুতি দেবার মতো অবস্থা আমাদের

নেই।' নেতাজি হেসে বললেন, 'এ নিয়ে আপনারা অনর্থক দুশ্চিন্তা কেন করছেন। আমার সঙ্গী (এ-ডি-কং) আর আমার জন্যে এ এক চমৎকার ব্যবস্থা হচ্ছে। দুই সরকারকে অজস্র ধন্যবাদ।'

জার্মানির কিয়েল বন্দর থেকে জার্মান ইউবোট বা সাব্‌মেরিনে সুভাষ আর তাঁর সহচর আবিদ হাসান সেই মারাত্মক ভ্রমণ আরম্ভ করলেন। সমুদ্রের পেট দিয়ে এক দীর্ঘ যাত্রা। সাবমেরিনে এসে ঢুকলেন ৮ ফেব্রুয়ারি, ১৯৪৩। এর মধ্যে পত্নী এমিলি শেংক্‌ল তাঁর বাপ মায়ের কাছে ফিরে গিয়েছিলেন। ১৯৪২-এর ২৯ নভেম্বর সেখানে কন্যা অনীতার জন্ম হল। নেতাজি যখন জার্মানি ছাড়ছেন তখন সে কন্যার বয়স দু-মাসের সামান্য বেশি। এমিলি স্বামীকে বিদায় দেবার জন্য বার্লিন এসেছিলেন। সুভাষ দাদা শরৎচন্দ্রকে বাংলায় একটি চিঠি লিখে এমিলির হাতে দিলেন। সে চিঠিতে তাঁর স্ত্রী আর কন্যার কথা জানালেন। দাদা যেন তাদের দেখেন, এই কাতর অনুরোধ ছিল সে চিঠিতে। তাঁর সব কাজে তো দাদাই সাহায্য করেছেন।

সুভাষ কি জানতেন আর এমিলির সঙ্গে তাঁর দেখা হবে না? কিংবা ওই-যে দু-মাসের ছোট্ট শিশু, যে তার বাবাকে চিনলই না ভালো করে, তারও মুখ তিনি আর দেখতে পাবেন না? হয়তো জানতেন। কিন্তু মাতৃভূমির স্বাধীনতার জন্য যিনি সর্বস্ব দেওয়ার জন্য তৈরি, এসব ব্যক্তিগত বন্ধন তো তাঁকে ছিঁড়তেই হবে। বুকের ভেতরে রক্তপাত হয়, তবু তাঁকে যেতে হবে। ঘরের সুখ তাঁর জন্য নয়।

সাবমেরিনে যাত্রা শুরু হল ৯ ফেব্রুয়ারি, ভোরে। ব্রিটিশ দ্বীপপুঞ্জের পশ্চিমে, আটলান্টিকের তলায় তলায় চলল সমুদ্রের পেটের মধ্যে দিয়ে তার যাওয়া। পুরো আফ্রিকা মহাদেশের পশ্চিম প্রান্ত ধরে তা দক্ষিণে চলল, তারপর উত্তমাশা অন্তরীপ ঘুরে তা উঠে এল উত্তরে। দু-মাসের একটু বেশি সময় পরে তা পৌঁছোল ম্যাডাগাস্করের কাছে।

এই দু-মাস কেমন কেটেছিল নেতাজির? আবিদ হাসান মজা করে লিখেছেন, সাবমেরিনের পেটে ঢুকতে যত চমৎকার লেগেছিল, ঢুকে তা মুহূর্তেই উবে গেল। চারদিকে ডিজেল তেলের কড়া গন্ধ। খাবার খাচ্ছি তাও ডিজেলের গন্ধমাখা। হাসান খুঁজে খুঁজে বার করলেন এক বস্তা চাল আর কিছু ডাল। ব্যস, রোজ দুজনের জন্যে ডালভাত চাপাতে

লাগালেন। নেতাজি তো মহাখুশি। সে খাবারে তেমন ডিজেলের গন্ধ নেই দেখে অবাক।

কিন্তু তিনি কি খাবার-দাবার নিয়ে ভাববার সময় পাচ্ছেন আদৌ? তিনি দিনরাত খেটে চলেছেন। তাঁর আত্মজীবনীর প্রথম ভাগ 'ভারতের সংগ্রাম'— এর দ্বিতীয় সংস্করণ হবে, তাই বইয়ের মধ্যে কাটাকুটি, নতুন লেখা চলছে। আর দক্ষিণপুব এশিয়াতে ভারতের স্বাধীনতা যুদ্ধ কেমন করে চালাবেন তার বিস্তারিত ছক তৈরি করছেন।

২৪ এপ্রিল যোগাযোগ হল জাপানি সাবমেরিন আই-টুয়েন্টিনাইনের সঙ্গে।

নেতাজি আর আবিদ হাসানকে জার্মান ইউ-বোট ছেড়ে এবার জাপানের ডুবো জাহাজে উঠতে হবে। সমুদ্রে খুব বড়ো বড়ো ঢেউ উঠছে, প্রবল ঝড়ের মতো বাতাস বইছে। দুটো জাহাজের পাশাপাশি আসা অসম্ভব। স্থির হল, একটা রবারের নৌকো করে নেতাজি আর আবিদ হাসানকে এক জাহাজ থেকে অন্য জাহাজে নিয়ে যাওয়া হবে। সেও এক বিপজ্জনক যাত্রা, যতই সংক্ষিপ্ত হোক।

অনেক সময় লাগল দুটি ডুবোজাহাজের ভেসে উঠে ঠিক ঠিক জায়গায় আসতে। এভাবে তারা উত্তর-পুবে চলল আরও চার দিন। উপর দিয়ে শত্রুপক্ষের প্লেন গেছে দু-একটা, কিন্তু তারা এ ডুবোজাহাজদুটিকে বোধ হয় তেমন সন্দেহ করেনি। সন্দেহ করলে এক মুহূর্তে বোমা ফেলে চুরমার করে দিতে পারত।

শেষে ২৮ এপ্রিল। সাবমেরিন দুটি এক জায়গায় এসে স্থির হল। দুজন জার্মান সৈন্য প্রথমে একটি রবারের ডিঙিতে জাপানি ডুবোজাহাজে গিয়ে পৌঁছোল, তারপর তার রেলিঙের থেকে একটা নাইলনের কাছি জার্মান ডুবোজাহাজ পর্যন্ত টেনে বেঁধে দিল। তারা ফেরার পর প্রবল ঢেউয়ের মধ্যে নেতাজি আর আবিদ হাসান তাঁদের ডিঙিতে নামলেন। প্রবল ঢেউ, চারপাশে প্রচুর হাঙরের আনাগোনা। অতি সাবধানে আই-টুয়েন্টি নাইন সাবমেরিনে উঠে পড়লেন। ঢেউয়ের ঝাপটায় তাঁদের দুজনেরই সারা শরীর ভিজে গেছে, প্রবল কাঁপুনি ধরেছে। তবু নেতাজির মনে হল, এ এশিয়ার একটা দেশের ডুবোজাহাজ, এই মানুষগুলো যেন জার্মানদের চেয়ে বেশি চেনা।

জাপানি ডুবোজাহাজ আবার দুজনকে নিয়ে অথই সমুদ্রে ডুব দিল।

প্রবল ঢেউ, চারপাশে প্রচুর হাঙরের আনাগোনা

বারো

সুভাষচন্দ্রের খুব হাঁটাহাটি করার অভ্যেস। বার্লিনেও বাড়ির একতলা-দোতলায় প্রচুর দৌড়ঝাঁপ করতেন। এই জাপানি ডুবোজাহাজের সরু পথে তাঁর হাঁটাহাঁটি খুব একটা জমত না, তাই খিদেই পেত না তেমন। দু-দিন পরেই ক্যাপটেনকে ঠাট্টা করতে আরম্ভ করলেন, 'আজ খাওয়ার ব্যাপারটা বাদ দিলে হয় না, ক্যাপটেন তেরাওকা?'

৬ মে ১৯৪৩ তারিখে ইন্দোনেশিয়ার সুমাত্রা অঞ্চলের এক ছোট্ট দ্বীপ সাবাং, তার বন্দরে আই-টুয়েন্টিনাইন ভেসে উঠল। জেটিতে উঠেই সুভাষ দেখতে পেলেন তাঁর বার্লিনের পুরোনো বন্ধু কর্নেল ইয়ামামোতো-কে। তিনি দক্ষিণপূর্ব এশিয়ায় জাপানিদের পক্ষে জনমত তৈরি করার দায়িত্বে আছেন, তাঁর সামরিক সংগঠনের নাম হিকারি কিকান। আজাদ হিন্দ ফউজের উপদেষ্টা হিসেবেও কাজ করছে এই হিকারি কিকান। ইয়ামামোতো জিজ্ঞেস করলেন, 'খুব ক্লান্ত লাগছে তো? ক-দিন বিশ্রাম করুন এখন।' সুভাষচন্দ্র হেসে প্রতিবাদ করলেন, 'মোটেই না, একেবারেই ক্লান্ত নই; বিশ্রাম কেন? এক্ষুণি রওনা হওয়ার জন্যে তৈরি।'

সুভাষচন্দ্র বলছি কেন? এখন কিন্তু তাঁর আর-একটি ছদ্মনাম হল। এটি জাপানি নাম মাৎসুদা। দ্যাখো মানুষটির কী আশ্চর্য ব্যক্তিত্ব। প্রথমে উত্তরপ্রদেশের মুসলমান, তারপর ইতালিয়ান, এখন জাপানি—পুব-পশ্চিম সব মিলিয়ে একেবারে সারা পৃথিবীর মানুষ। যে-মানুষটি ভারত নামে একটা দেশের স্বাধীনতা-সংগ্রামকে সারা পৃথিবীতে ছড়িয়ে দিতে চেয়েছিলেন, পেরেওছিলেন, সেই মানুষটিও কি শুধু বাঙালি ছিলেন, না ভারতীয় ছিলেন? তিনি ছিলেন সারা পৃথিবীর লোক, পৃথিবীর নেতা।

দিন পাঁচেক পরে সাবাং থেকে রওনা হয়ে গেলেন সুভাষ। নানা জায়গায় থেকে মে-র মাঝামাঝি পৌঁছোলেন তোকিয়োতে। সেখানে ইম্পিরিয়াল হোটেলে মহাসমাদরেই তাঁকে রাখা হল।

জাপানের সৈন্যবাহিনীর সর্বাধিনায়ক জেনারেল তোজো-র সঙ্গে দেখা হওয়ার সুযোগ খুঁজছিলেন সুভাষচন্দ্র, কিন্তু তোজো সম্ভবত একটু এড়িয়ে যাচ্ছিলেন তাঁকে। অন্যান্য জাপানি মন্ত্রী সেনাপতি ইত্যাদির সঙ্গে অবশ্য সুভাষের দৈনিক দেখাশোনা, কথাবার্তা হচ্ছিল। তাতে সুভাষচন্দ্রের সুবিধেই হল একটু। তিনি জাপানের মানুষ আর শাসকেরা কী চাইছে এই যুদ্ধে, তার একটা ব্যাপক ধারণা গড়ে তোলবার সময় পেলেন। তিনি নিজেও যুদ্ধের গতিপ্রকৃতি মন দিয়ে লক্ষ করছিলেন, দেখছিলেন, পুবে হোক পশ্চিমে হোক জার্মানি-ইতালি-জাপানের যুদ্ধ একটু বেকায়দায় পড়েছে। সম্ভবত এই কারণেই তোজো সুভাষের সঙ্গে দেখাসাক্ষাৎ এড়িয়ে যাচ্ছিলেন। যদি সুভাষ যা চাইবেন তা দেওয়া শেষপর্যন্ত জাপানের সাধ্যে না কুলোয়?

যাই হোক, জুনের দশ তারিখে তোজো সাক্ষাৎ করলেন সুভাষের সঙ্গে। আর দেখা হওয়া মাত্রই তাঁর ব্যক্তিত্বে, আন্তরিকতায়, জ্বলন্ত স্বদেশপ্রেমে একেবারে মুগ্ধ হয়ে গেলেন। বুঝতে পারলেন যে, এ মানুষটি শুধু স্বপ্ন দেখতে শেখেননি, স্বপ্নের জন্যে সর্বস্ব দিতে তৈরি। আর নিছক স্বপ্নই দেখেন না, যুদ্ধের প্রতিটি পদক্ষেপ তাঁর নখদর্পণে। আজাদ হিন্দ ফউজ কোথায় কীভাবে জাপানের বাহিনীকে সাহায্য করতে পারবে, ভারত-বর্মা সীমান্ত দিয়ে মণিপুরে (তখন আসামের অন্তর্গত) এগোতে হলে ভারতীয় মুক্তিবাহিনী কী ভূমিকা নেবে— সব যেন ছবির মতো তাঁর মনে আঁকা হয়ে আছে। তোজো বিস্মিত, অভিভূত। তিনি সুভাষকে আমন্ত্রণ করলেন জাপানের 'দিয়েত' বা লোকসভার একটি অধিবেশনে উপস্থিত হওয়ার জন্য। বিদেশির কাছে এ এক দুর্লভ সম্মান, তাঁকে যেন এক স্বাধীন রাষ্ট্রনায়কেরই মর্যাদা দেওয়া হল। সেখানেই তোজো উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে জানালেন, ভারতের স্বাধীনতা লাভের জন্য জাপান যা করা সম্ভব সবই করবে। ক-দিন পরে এক বিশাল সাংবাদিক সম্মেলনে সুভাষ তাঁর মাৎস্যদা ছদ্মনামের খোলস

ছেড়ে সুভাষচন্দ্র বোস নামেই আবির্ভূত হলেন। বললেন, 'অক্ষশক্তি জিতলে নিশ্চয়ই ভারতের স্বাধীনতা লাভের পথ সুগম হবে। কিন্তু এ স্বাধীনতা আনব আমরা আমাদের রক্ত ঝরিয়ে। অন্যেরা স্বাধীনতা আমাদের হাতে তুলে দেবে না।' এই সময় থেকেই জাপান থেকেও জাপানের রেডিয়োতে নিয়মিত তিনি ভাষণ দিতে শুরু করলেন।

এবার দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার বিশাল ক্ষেত্র থেকে ডাক এল, 'নেতাজি, আপনাকে আমরা এক্ষুনি চাই। আপনি এসে আজাদ হিন্দ বাহিনীর নেতৃত্ব গ্রহণ করুন।' জার্মানির মতোই সিঙ্গাপুরে তৈরি হয়েছিল একটি আই এন এ বা ভারতীয় জাতীয় ফউজ। ১৯৪২-এর ডিসেম্বরে। এই বাহিনী গঠিত হওয়ার পর সেনাপতি মোহন সিং হঠাৎ বিশ্বাসঘাতকতা করে আবার ব্রিটিশ সৈন্যবাহিনীতে ফিরে যান। তাতে আজাদ হিন্দ বাহিনীর মনোবলে আঘাত লাগে। ভারতের প্রবীণ বিপ্লবী রাসবিহারী বসু ছিলেন ইন্ডিয়া ইন্ডিপেন্ডেন্স লিগের সভাপতি। তিনিই এই ফউজেরও দেখাশোনা করছিলেন, কিন্তু যুদ্ধের কোনো অভিজ্ঞতা তাঁর ছিল না। রাসবিহারী দিল্লিতে সম্রাট পঞ্চম জর্জের দরবারে বোমা ছুঁড়ে জাপানে পালিয়ে গিয়েছিলেন, সেখানেই জাপানের এক অভিজাত পরিবারে বিয়ে করে জাপানের নাগরিক হিসেবে তোকিয়োতে বসবাস করছিলেন। নেতাজি যখন জাপানে এসে পৌঁছোলেন, তখন রাসবিহারীর অনেক বয়স। দেহের শক্তি, মনের জোর দুইই কমে এসেছে। অবশ্যই মানুষটি পুব-দক্ষিণ এশিয়ায় ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে নেতা হওয়ার যোগ্য, কিন্তু এই বয়সে নয়। অথচ জাপানিরা প্রবীণদের খুব ভক্তি করে, তারা বলতেও পারছিল না তাঁকে যে, 'এবার আপনি বিশ্রাম নিন।' কিছুদিন আগে এক জাপানি সেনানায়ক সেইজো আরিসুয়ে তাঁকে জিজ্ঞেস করেছিল, 'নেতাজি জাপানে আসছেন শুনছি। তিনি এলে তাঁর কী কাজ হবে কিছু ভেবেছেন আপনি?'

রাসবিহারী হয়তো ইঙ্গিতটা বুঝেছিলেন। তিনি শান্ত হেসে বলেছিলেন, 'নেতাজি সকলের নেতা, সব নেতার নেতা। তিনি এলে আমার সমস্ত দায়িত্ব তাঁর হাতে তুলে দিয়ে আমি নিশ্চিন্ত হব।'

রাসবিহারীর সেই মহৎ প্রতিশ্রুতি রাখার লগ্ন এবার এগিয়ে এল। ২৭ জুন (১৯৪৩)-এ নেতাজিকে সঙ্গে নিয়ে রাসবিহারী প্লেনে এসে পৌঁছোলেন সিঙ্গাপুরে। শুধু সিঙ্গাপুর কেন, সমস্ত দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় সাড়া পড়ে গেল, 'নেতাজি এসেছেন! নেতাজি এসেছেন!' এতদিন তাঁর কথা সবাই শুনেছে কিংবদন্তির মতো, রেডিয়োতে তাঁর আগুন ঝরানো কণ্ঠস্বরও শুনেছে। কিন্তু তবু তিনি ছিলেন দূরের মানুষ— রূপকথার রাজপুত্রের মতো নানা অসাধ্য সাধন করে বেড়ান। ব্রিটিশ পুলিশের চোখে ধুলো দিয়ে ছদ্মবেশে বাড়ি থেকে পালান, সেই কাবুল হয়ে ইয়োরোপে পাড়ি দেন, বার্লিন থেকে ইয়োরোপের নানা দেশে দৌড়ে বেড়ান, রাষ্ট্রপ্রধানদের সঙ্গে দেখা করেন। এমনকি হিটলারের সঙ্গে সাক্ষাৎকারে হিটলার যখন অবজ্ঞা করে বলেন যে, আগামী দেড়শো বছরেও ভারতের স্বাধীন হওয়ার কোনো আশা নেই, হাজার হাজার মাইল দূরে পড়ে আছে যে দেশ তা কি বসু গুটিকয়েক সৈন্য নিয়ে দখল করতে পারবেন? তখন নেতাজি বিরক্ত হয়ে আলোচনা ছেড়ে বেরিয়ে এসে হিটলারের পরামর্শদাতা ফন ট্রট্‌কে বলেন, 'আপনার প্রভুকে বলবেন আমি সারাজীবন রাজনীতি করে এসেছি, আমার কারও কাছে জ্ঞান নেবার কোনো দরকার নেই!'

সেই নেতাজি এসে পৌঁছেছেন সিঙ্গাপুরে, দক্ষিণপূর্ব এশিয়ায়, যেখানে লক্ষ লক্ষ ভারতীয় বাস করে। এসেছেন সেই কল্পরাজ্যের রাজকুমার। যিনি পক্ষীরাজ ঘোড়া ছুটিয়ে পাহাড় সমুদ্র তেপান্তর ডিঙিয়ে উদ্ধার করে আনবেন সেই বন্দিনি রাজকন্যাকে, যার নাম দেশের স্বাধীনতা। 'নেতাজি! নেতাজি!'— এই নাম ক-দিন ধরে ফিরতে লাগল ওই অঞ্চলের ভারতীয়দের মুখে মুখে।

শেষে ৪ জুলাই ইন্ডিয়া ইন্ডিপেন্ডেন্স লিগের সাধারণ সভা বসল, সিঙ্গাপুরের ক্যাথে থিয়েটারের হলঘরে। সারা পুব আর দক্ষিণ-পুব এশিয়া থেকে দু হাজার প্রতিনিধি যোগ দিয়েছেন সম্মেলনে। সাতটি সুন্দরী মেয়ে মুখে চকচকে খুশি নিয়ে ফুলের তোড়া তুলে দিল নেতাজির হাতে, হাততালিতে সারা হল ফেটে পড়ল। সরস্বতী বলে একটি মেয়ে উঠে দাঁড়িয়ে গাইল নেতাজির জন্যে বিশেষভাবে লেখা একটি গান— 'সুভাষজি! সুভাষজি!'

আর লিগের সভাপতি রাসবিহারী উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, 'ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের এক সংগ্রামী অধ্যায় এবার আরম্ভ হবে। আপনাদের জানাই, আপনাদের জন্যে আজ আমি এক উপহার নিয়ে এসেছি। সুভাষচন্দ্র বসু সেই উপহার। ইনি ভারতের তরুণদের মধ্যে যা কিছু শ্রেষ্ঠ, যা মহত্তম, যা সবচেয়ে দুর্ধর্ষ আর গতিশীল— তারই প্রতীক। আজ আপনারা সকলে এখানে আছেন, আপনাদের সকলের উপস্থিতিতে আমি ইন্ডিয়া ইন্ডিপেন্ডেন্স লিগের সভাপতির পদ থেকে সরে যাচ্ছি। সুভাষচন্দ্র বোস এই মুহূর্ত থেকে এই লিগের সভাপতি হবেন; তিনিই হবেন ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে আপনাদের নেতা। আমি জানি, তাঁরই নেতৃত্বে আপনারা এ সংগ্রামে জয়ী হবেন।'

আবার হাততালিতে ফেটে পড়ল সভা। সেই মুহূর্ত থেকে রাসবিহারী আবার চলে গেলেন ইতিহাসের আড়ালে, সুভাষচন্দ্রকে নেতার সিংহাসনে এনে বসিয়ে। আর তাঁর কথা দু-একবার শুনতে পাব আমরা। দেশের মানুষও হয়তো ভুলেই যাবে স্বাধীনতা যুদ্ধের এই এক মহৎ যোদ্ধার কথা।

পরের দিন নেতাজি সর্বাধিনায়ক হিসেবে প্রায় ১৩,০০০ সৈন্যের একটি বাহিনীকে পরিদর্শন করলেন সিঙ্গাপুরের টাউন হলের মাঠে। কুচকাওয়াজের জন্য সার বেঁধে দাঁড়ানো হাতে রাইফেল নিয়ে তৈরি এই বাহিনীর এক একটি দল একের পর এক তাঁদের সর্বাধিনায়ককে অভিবাদন জানাতে লাগল। এই ৫ই জুলাইকে নেতাজি বলেছেন তাঁর জীবনের সবচেয়ে স্মরণীয়, গর্ব করার মতো দিন। এতদিন এই বাহিনীর নাম ছিল ইংরেজিতে আই এন এ— ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল আর্মি। তিনি এবার এর ভারতীয় নাম দিলেন উর্দুতে— আজাদ হিন্দ ফউজ— 'স্বাধীন ভারতের সৈন্যবাহিনী।' আর এই সৈন্যদের উদ্দেশ্যে তিনি বললেন,

"আমি তোমাদের তেমন কিছুই দিতে পারব না। বরং আমার কাছ থেকে তোমরা পাবে ক্ষুধা আর তৃষ্ণা, দারুণ কষ্ট, পাবে অন্তহীন রক্তাক্ত সংগ্রাম, পাবে মৃত্যু। কিন্তু এ সব কিছুর মধ্যে আমি থাকব তোমাদের সঙ্গে; থাকব অন্ধকারে থাকব আলোতে; থাকব দুঃখে থাকব আনন্দে;

থাকব দুর্গতিতে, থাকব জয়ের মুহূর্তে। তোমরা জীবনে হোক, মৃত্যুতে হোক আমাকে অনুসরণ করো, আমি তোমাদের পৌঁছে দেব বিজয়ে, স্বাধীনতার সিংহদ্বারে।

আমার সৈনিক বন্ধুগণ! তোমাদের কণ্ঠে ধ্বনিত হোক আমাদের নূতন রণ-ধ্বনি, 'চলো দিল্লি। চলো দিল্লি!' এই যে যুদ্ধ আরম্ভ হবে, এতে আমরা ক-জন শেষ পর্যন্ত বেঁচে ফিরব জানি না। কিন্তু এটুকু জানি যে, শেষে জয় আমাদের হবেই, এবং আমাদের বিজয়ী বীরেরা যখন কুচকাওয়াজ করতে করতে দিল্লির লাল কেল্লায় গিয়ে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যকে কবর দেওয়ার ব্যবস্থা করবে তখনই আমাদের এ লড়াইয়ের কাজ শেষ হবে।'

এ বক্তৃতায় যেমন প্রথম উচ্চারিত হল 'চলো দিল্লি!' তেমনই নেতাজি শেষ করলেন 'ইনকিলাব জিন্দাবাদ' (বিপ্লব দীর্ঘজীবী হোক) আর 'আজাদ হিন্দ্ জিন্দাবাদ' দিয়ে।

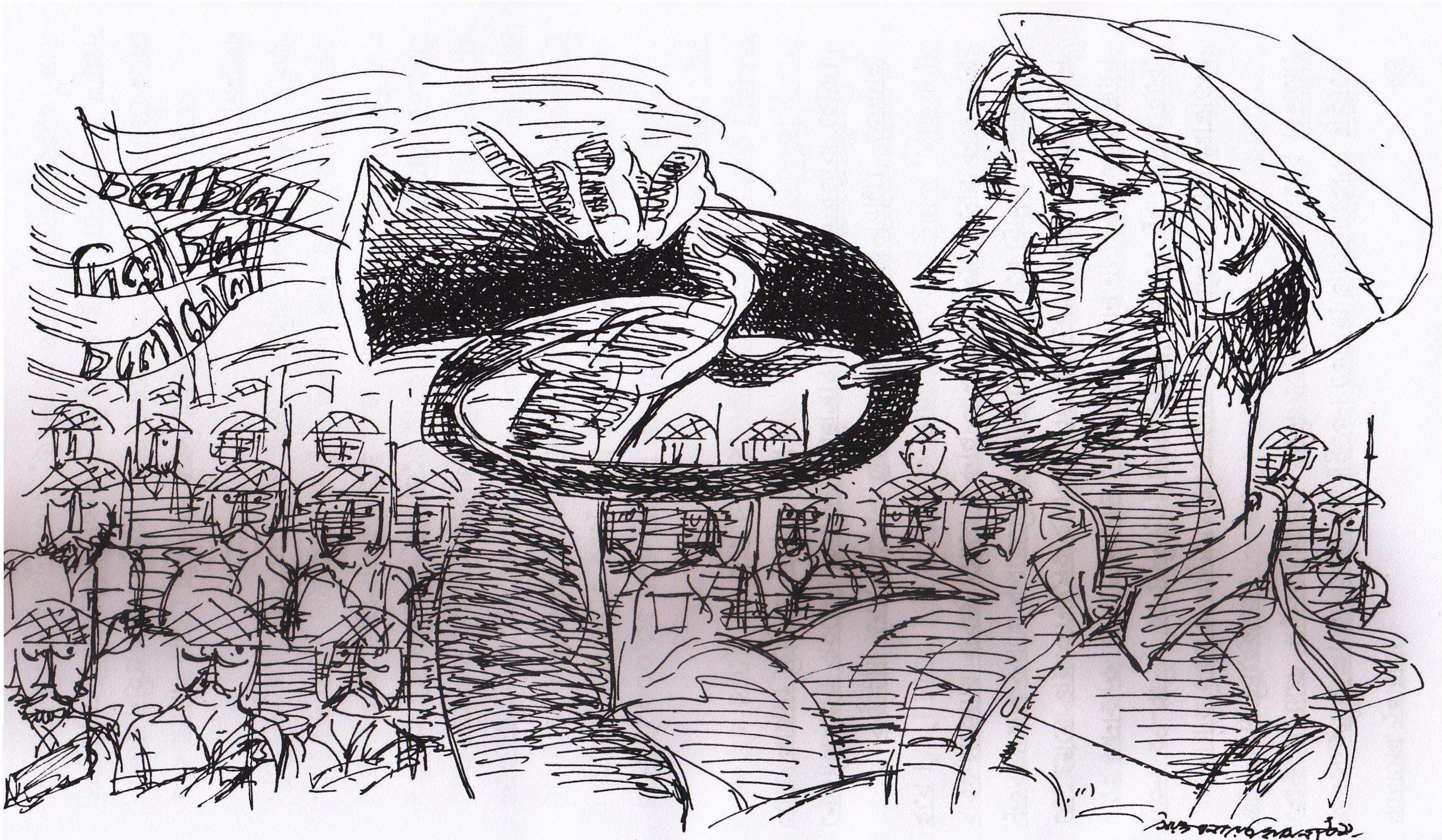

চলো দিল্লি

তেরো

সুদক্ষ সেনাপতির মতো এবার নেতাজি তাঁর কাজগুলো পরপর ভেবে নিলেন। প্রথমে আজাদ হিন্দ ফউজের একটা দুর্ধর্ষ, সামরিক চেহারা দেওয়া; তারপরে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার সমস্ত ভারতীয়দের এই স্বাধীনতার সংগ্রামে এগিয়ে আসার জন্য ডাক দিতে হবে। সকলে সৈন্যদলে ভর্তি না হোক, অর্থ দিয়ে, সম্বল দিয়ে, অস্ত্র দিয়ে, আশ্রয় দিয়ে— যে যেভাবে পারে সাহায্য করবে। সৈন্যরা যুদ্ধ করবে ফ্রন্টে, যুদ্ধক্ষেত্রে, আর অন্য ভারতীয়রা যুদ্ধ করবে যে যেখানে আছে সেখানেই থেকে। কাজেই আজাদ হিন্দ ফউজের আড়ালে এক অদৃশ্য যুদ্ধের সৈন্যদল হিসেবে এই ভারতীয়দের ডেকে আনতে হবে। শুধু ভারতীয় কেন? ফিলিপিনো, বর্মি, চীনা, ইন্দোনেশীয়, ভিয়েতনামি— ওই অঞ্চলের যত অধিবাসী আছে, সরকার আর জনগণ— সকলকে ভারতের সহায়তায় আহ্বান জানাতে হবে। তারপর কাজ, প্রবাসে একটি স্বাধীন ভারতীয় সরকার গড়ে তোলা- তাও খুব জরুরি। নইলে কার হুকুমে এই ফউজ যুদ্ধ করবে, কার হয়ে? এ বাহিনী তো জাপানের তাঁবেদার নয়, জাপান সরকারের হুকুমের অধীন তার প্রাণ গেলেও হবে না। জাপানের যুদ্ধ-সেনাপতির অধীনেও এ ফউজ কাজ করবে না। এ হবে এক বন্ধু সরকারের সৈন্যদল— সেই সরকারের অধীন। সেই সরকারের একমাত্র লক্ষ্য হল সম্মুখ-যুদ্ধে ব্রিটিশকে পরাজিত করে ভারতের স্বাধীনতা ছিনিয়ে নেওয়া। আর আর-একটি কাজ হল, বর্মার সীমান্তে পৌঁছানোর জন্যে সহযোগিতা দরকার। রসদ, অস্ত্র, পাশাপাশি লড়াই— সবটাতেই জাপানিদের বড়ো ভূমিকা থাকবে।

সৈন্যদলকে সামনাসামনি যুদ্ধের উপযোগী করে তোলার জন্য যা-যা করা দরকার, নেতাজি আর তাঁর সহযোগীরা প্রাণপণ সেই চেষ্টায়

নেমে পড়লেন। এর মধ্যে নেতাজির মাথায় এমন একটা ভাবনা এল যা সে যুগে কোনো সেনাপতিই ভাবতে চাননি। নেতাজি ভাবলেন শুধু মেয়েদের নিয়ে একটা ছোটো সৈন্যদল তৈরি করলে কেমন হয়?

সবাই তা শুনে প্রায় আঁতকে উঠেছিল। বিশেষ করে জাপানিরা। যুদ্ধ তো পুরুষের কাজ, মেয়েরা সেখানে করবে কী? হ্যাঁ, তারা হাসপাতালের নার্স হতে পারে, কিংবা টেবিলে বসে কেরানির কাজ, টেলিগ্রাম পাঠানো, কিংবা বড়ো জোর গুপ্তচরের কাজ করতে পারে। কিন্তু তাই বলে রাইফেল বাগিয়ে যুদ্ধ? কামান-বন্দুকের সামনে ঝাঁপিয়ে পড়া? নেতাজি কি পাগল হয়েছেন?

নেতাজি বললেন, না, এটা আমার পাগলামি নয়। মেয়েরা সবক্ষেত্রেই পুরুষের সঙ্গে সমান তালে এগিয়ে যাচ্ছে, যুদ্ধেই বা তারা পিছিয়ে থাকবে কেন? তাদেরও রণক্ষেত্রে গিয়ে লড়াই করতে হবে। অনেকেই বারণ করল, কেউ কেউ ব্যাপারটা নিয়ে হাসিঠাট্টাও করতে লাগল, কিন্তু হাসিঠাট্টাতে যদি ঘাবড়ে যাবেন তাহলে নেতাজি আর নেতাজি কেন?

সিঙ্গাপুরে ডাক্তারি করতেন লক্ষ্মী স্বামীনাথন্। তাঁকে ডাকলেন নেতাজি। বললেন, তোমাকে ভার দিলাম, তোমাকে শুধু মেয়েদের নিয়ে একটি সৈন্যের ছোটো কম্পানি তৈরি করতে হবে। পারবে তো?

লক্ষ্মী স্বামীনাথন্ (পরে ক্যাপটেন লক্ষ্মী সেহ্গল) পরে লিখছেন— আমি জবাব দেব কী, আমার মুখে কথা সরল না। এ কী আশ্চর্য দৃপ্ত এক বীর, যিনি নিজে স্বপ্ন দেখেন, অন্যের মনেও সেই স্বপ্ন জ্বলজ্বল করে ওঠে। তাঁর কথায় না বলি আমার সাধ্য কী?

দেখতে দেখতে লক্ষ্মী তৈরি করে ফেললেন প্রায় এক হাজার মেয়ের এক বাহিনী, তার নাম হল ঝাঁসির রানি বাহিনী। এই মেয়েরা ছিল নেতাজির বিশেষ স্নেহের পাত্রী। তিনি ছিলেন একই সঙ্গে তাদের বাবা আর মা। নিজের শিশুকন্যা বাবাকে চেনার মতো বড়ো হয়নি, তাকে তিনি চিরকালের মতো ছেড়ে চলে এসেছেন। কে জানে, ঝাঁসির রানি বাহিনীর ওই এক হাজারটি মেয়েকে পেয়ে তাঁর স্নেহের ক্ষুধা মিটেছিল কি না!

নেতাজি এবার আর-একবার তাঁর পোশাক বদলালেন। এবার তাঁর গায়ে মিলিটারি পোশাক উঠল। যুদ্ধের পোশাক—কাঁধে ফিতে লাগানো পুরো হাতা, বোতামওয়ালা খাকির শার্ট, প্যান্ট, পায়ে বড়ো বুট, মাথায় মিলিটারি ক্যাপ। পোশাকে খুব বেশি ব্যাজট্যাজ নেই— কিন্তু তাঁর দিকে একবার তাকালেই বোঝা যেত, ইনি সেনাপতি ছাড়া আর কিছুই হতে পারেন না।

এবার দক্ষিণ-পুব এশিয়ার মানুষদের ডাক দেবার পালা। কে আছে ভারতমাতার যোগ্য সন্তান, দেশের মুক্তির জন্য যে যা পার তুলে দাও এই যোদ্ধাদের হাতে। নেতাজির হাতে!

তা দিয়েছিল বহু মানুষ। কেউ নেতাজির গলার মালাটি নিলামে কিনল সর্বস্ব দান করে, কেউ দিল লক্ষ ডলার, মেয়েরা দিল সোনার অলংকার খুলে, গরিব মধ্যবিত্ত কেরানি, উকিল ডাক্তার ব্যবসায়ী সকলে দিল যার যা সামর্থ্য। দেখতে দেখতে বহু লক্ষ ডলার জমা পড়ল আজাদ হিন্দ ফউজের ভাণ্ডারে। সিঙ্গাপুরে, ব্যাঙ্ককে, সায়গনে, সাংহাইয়ে— যেখানে যান নেতাজি সেখানেই তাঁর হাতে দান এসে পৌঁছোয়।

তবু যুদ্ধের যা বিপুল খরচ সে তুলনায় এ দান কিছুই নয়। প্রায় ত্রিশ লক্ষ ভারতীয় বাস করে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায়, তাদের বহু লোক মুখ ফিরিয়ে থাকে। তারা ওদেশে গেছে টাকা কামাতে, দান-খয়রাত করতে তো নয়। ভারত স্বাধীন হল বা না হল তাতে তাদের কী এসে যায়?

নিরুপায় হয়ে নেতাজি জাপান সরকারের কাছেই সাহায্য চান, প্রতিশ্রুতি দেন যে স্বাধীন ভারতের সরকার তার প্রত্যেকটি পয়সা শোধ করে দেবে। দেখে দুঃখ হয়, রাগও হয় যে, এই একটি লোককেই ভিক্ষের ঝুলি নিয়ে যেতে হয় ভারতীয়দের কাছে, বোঝাতে হয়। জাপান প্রথমে আপত্তি করেছিল। পরে তোজো নেতাজিকে বললেন, 'না, আপনার দেশের লোকের কাছ থেকে আপনি যা পান গ্রহণ করুন।'

রেঙ্গুনের ভারতীয় ব্যবসায়ী হবিব তাঁর সমস্ত ধনসম্পত্তি বাড়িঘর নেতাজির হাতে তুলে দিয়ে একদিনে পথের ফকির হয়ে গেলেন।

এর মধ্যেই ব্রহ্মদেশে (এখনকার মিয়ানমার-এ) গিয়ে সেখানকার স্বাধীনতা-উৎসবে যোগ দিয়ে এলেন নেতাজি। ১ আগস্ট (১৯৪৩) ইংরেজের শাসনের অবসান ঘটিয়ে স্বাধীনতা ঘোষণা করল বার্মা। সেখানেও জাপানিদের সহযোগিতায় তৈরি হয়েছিল বার্মা আত্মরক্ষী বাহিনী। তার অধিনায়ক বা-ম নেতাজিকে খুবই সমাদর করলেন।

শেষে জাপানি প্রধানমন্ত্রী তোজো মেনে নিলেন নেতাজির দাবি, একটি প্রবাসী অস্থায়ী স্বাধীন ভারত সরকার গঠনের। নেতাজি আর-একটি স্বপ্নকে রূপ দেওয়ার জন্য দিনরাত্রি খাটতে লাগলেন। তাঁর পরিশ্রম করা দেখে একজন জাপানি সেনাপতি বলেছিল, 'এ মানুষটি দেখি গোটা চব্বিশ ঘণ্টাই বেঁচে থাকেন দিনে, আমাদের মতো মাঝে-মধ্যে ছুটিও নেন না।' পরে চিনের নানকিং সরকারের রাষ্ট্রপতি ওয়াং-জিং-ওয়েই-ও অবাক হয়েছিলেন, বলেছিলেন 'মি. বোস আপনি থাকেন প্রায় ভিখারি-ফকিরের মতো, কিন্তু এমন অফুরন্ত শক্তি পান কোথায় বলুন তো?' নেতাজি উত্তর দেননি, হেসেছিলেন একটু।

২১ শে অক্টোবর ঘোষিত হল সেই অস্থায়ী আজাদ হিন্দু সরকার— 'হুকুমতে আজাদ হিন্দ'। সিঙ্গাপুরে, সমস্ত পূর্ব এশিয়া থেকে আসা এক হাজার প্রতিনিধির উপস্থিতিতে। এই সরকারে নিযুক্ত হলেন পাঁচ জন মন্ত্রী। আজাদ হিন্দ বাহিনীর আটজন, আর অ-সামরিক ভারতীয় অধিবাসীদের আটজন প্রতিনিধি এর উপদেষ্টা অফিসার হিসেবে যুক্ত হলেন। রাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রী আর যুদ্ধ ও বিদেশমন্ত্রীর দায়িত্ব নিলেন স্বয়ং নেতাজি। নারী-সংগঠনের মন্ত্রী হলেন ক্যাপটেন লক্ষ্মী স্বামীনাথন্। প্রচার ও প্রকাশনা মন্ত্রী নেতাজির দীর্ঘদিনের সহযোগী সাংবাদিক এস এ আয়ার, অর্থমন্ত্রী হলেন লেফ্‌টেন্যান্ট কর্নেল এ সি চ্যাটার্জি। আর মন্ত্রীর মর্যাদা পেলেন সরকারের সচিব এ এম সহায়।

২৩শে অক্টোবরই জাপান সরকার স্বীকৃতি দিল এই স্বাধীন ভারত সরকারকে। দেখতে দেখতে স্বীকৃতি এসে পৌঁছোল জার্মানি, ইতালি, ক্রোয়েশিয়া, মাঞ্চুকুয়ো, নানকিং (চিন), ফিলিপিন্‌স, থাইল্যান্ড আর বার্মা সরকারের। আয়ার্ল্যান্ড থেকে ইমন ডি ভ্যালেরা উচ্ছ্বসিত অভিনন্দন-বার্তা পাঠালেন।

পরদিনই অস্থায়ী এই স্বাধীন ভারত সরকার ইংল্যান্ড আর আমেরিকার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করল। সিঙ্গাপুরে প্রায় অর্ধ লক্ষ মানুষ শুনল তাঁর উদ্দীপনাময় বক্তৃতা— 'এ যুদ্ধ স্বাধীনতার যুদ্ধ। যুদ্ধ শুরু হল, যেদিন এর শেষ হবে সেদিন দিল্লির বড়োলাটের বাড়ির চুড়োয় ভারতের তিনরঙা পতাকা উড়বে।'

পঞ্চাশ হাজার মানুষের সম্মিলিত জয় ঘোষণা আকাশে ঢেউ তুলল— 'নেতাজি কী জয়! ইনকিলাব জিন্দাবাদ! চলো দিল্লি!'

এর মধ্যে বাংলা থেকে দুর্ভিক্ষের খবর এসেছে, নেতাজি শুনে উদ্‌বেল হয়ে উঠলেন। রেডিয়োতে তিনি বললেন, এ দুর্ভিক্ষ সাম্রাজ্যবাদী ব্রিটিশদের তৈরি। তারাই মানুষের ক্ষুধায় অন্ন যুদ্ধের কাজে চালান করে দিয়েছে, তারা কলকাতা শহরকে বাঁচাবার জন্যে বাংলার গ্রামকে শুকিয়ে মারছে। যতদিন বিদেশি দেশ শাসন করবে ততদিন তারা প্রজাদের এইভাবেই মারবে।

দুর্ভিক্ষের সময় বড়োলাট লর্ড লিনলিথগো একবার উঁকি দিয়েও দেখলেন না কলকাতায় ফুটপাথে অনাহারী মানুষের মৃতদেহ কীভাবে জমে উঠছে। নেতাজি এই সময় প্রাণপণ চেষ্টা করেছিলেন বার্মা থেকে জাহাজে করে বাংলায় চাল পাঠানোর। জাপানিরা রাজি হয়নি। প্রায় অর্ধকোটি বাঙালি না খেয়ে মারা যায় এই দুর্ভিক্ষে।

বছরের শেষে এল মা প্রভাবতীর মৃত্যুর খবর। কর্নেল ইয়ামামোতো সান্ত্বনা দিতে গিয়ে দেখেন, নেতাজির চোখ দিয়ে ঝরঝর করে জল পড়ছে, ছোটো শিশুর মতো কাঁদছেন তিনি। ইয়ামামোতো বিস্মিত হয়ে লিখেছেন, 'এমন ভেঙে পড়তে তো কখনও দেখিনি মানুষটিকে।'

বাবার মৃত্যুর সময় কাছে থাকতে পারেননি। মার মৃত্যুও ঘটল সেই কত দূরে। সুভাষ ছিলেন মার সবচেয়ে আদরের ছেলে— তাঁর ওই কান্নায় অবাক হওয়ার কিছু নেই।

দুর্ভিক্ষের সময় বড়োলাট লর্ড লিনলিথগো একবার উঁকি দিয়েও দেখলেন না

চোদ্দ

এতদিন নেতাজি বারবার বলে আসছিলেন জাপানিদের, এইবার শুরু হোক সেই চরম যুদ্ধ, যাতে এক প্রবল ধাক্কায় বর্মায় সীমানা পেরিয়ে আজাদ হিন্দ ফউজ আর জাপানের বাহিনী পৌঁছে যাবে ভারতের মাটিতে। সেই মাটিতে একবার যদি পা রাখতে পারে এই ফউজ, তাহলে এক মুহূর্তে সারা ভারত বিপ্লবের আগুনে জ্বলে উঠবে, ব্রিটিশ শাসনের সমস্ত চিহ্ন পুড়িয়ে নিঃশেষ করে দেবে। জাপানিরা কেমন যেন দ্বিধায় ছিল। নেতাজি ধৈর্য হারাছিলেন। 'আর কত দেরি করবে তোমরা?' প্রশ্ন করছিলেন জাপানিদের।

জাপানিদের দ্বিধায় কারণ ছিল। যুদ্ধে কী তাদের, কী তাদের বন্ধুদের অবস্থা তেমন ভালো নয়। এর মধ্যেই ইতালি হার স্বীকার করে ব্রিটিশদের কাছে আত্মসমর্পণ করেছে। চিনের সঙ্গে যুদ্ধে জাপান নিজেও তেমন সুবিধে করতে পারছে না, ওদিকে জার্মানরাও বেশ মার খাচ্ছে সোভিয়েত ইউনিয়নের সৈন্যদলের হাতে। এটা ঠিক যে, বার্মার চিন্দুইন নদীর পুব পার পর্যন্ত জাপানিদের দখলে। ১৯৪২-এ ই ইংরেজকে বার্মা থেকে ঝেঁটিয়ে বিদায় করেছে তারা, তবু যুদ্ধের গতিক তো তত সুবিধের নয়। নতুন আক্রমণের ঝুঁকি নেওয়ার আগে তাই অনেক সাত-পাঁচ ভাবছিল তারা। চিন্দুইন নদীর পশ্চিমে আর একটু দূরেই অবশ্য ভারতের সীমানা— একটা জোরালো আক্রমণ করলে দু-দিনেই ভারতের পুবের সীমানা ঝড়ের মতো তাদের দখলে এসে যাবে। তবু তারা একটু সময় নিচ্ছিল মনস্থির করতে।

এর মধ্যে তোজোর সরকার আর জাপানি যুদ্ধবাহিনী অবশ্য একটা ভালো কাজ করেছিল। আসাম সীমান্ত দিয়ে ভারতে পৌঁছোতে না পারুক, তারা দখল করে নিয়েছিল আন্দামান আর নিকোবর দ্বীপ ও

সমগ্র দ্বীপপুঞ্জ। সেও তো ভারতের মাটি! জাপান সরকারের সঙ্গে নেতাজির চুক্তিই ছিল, ভারতের যে-অংশই জাপানের সৈন্যরা দখল করুক, তার শাসনভার আজাদ হিন্দ সরকারের হাতে দিতে হবে। জাপান ভারতের এতটুকু জমি নিজের দখলে রাখতে পারবে না।

তোকিয়োর এক সম্মেলনে (৫-৬ নভেম্বর, ১৯৪৩), তোজো ঘোষণা করলেন আন্দামানের শাসনভার এবার তুলে দেওয়া হবে আজাদ হিন্দের অস্থায়ী সরকারের হাতে। নেতাজির আর এক স্বপ্ন পূর্ণ হওয়ার দিকে এগিয়ে গেল। ২৯ ডিসেম্বর তিনি পা দিলেন আন্দামানে। এই দ্বীপে ব্রিটিশের কুখ্যাত সেলুলার জেলে হাজার হাজার শহীদের ফাঁসি হয়েছে, ঘটেছে গুলিতে মৃত্যু, দুঃসহ নির্যাতনে মৃত্যু। সেই সেলুলার জেলের মাটিতে দাঁড়িয়ে নেতাজি স্বাধীন ভারতের পতাকা তুললেন। লেফটেন্যান্ট কর্নেল এ ডি লোকনাথন-কে এর চিফ কমিশনার নিযুক্ত করলেন।

আর আন্দামান দ্বীপের নতুন নাম দিলেন শহীদ দ্বীপ, নিকোবরের নাম— স্বরাজ দ্বীপ। বললেন, এই শুরু হল। এবার সশস্ত্র যুদ্ধে একের পর এক ভারতের ভূখণ্ড আজাদ হিন্দ সরকারের দখলে আসবে।

এই ডিসেম্বরেই তোজো রাজি হলেন, 'হ্যাঁ, জাপানি আর আজাদ হিন্দ বাহিনী এবার বার্মার সীমান্ত দিয়ে ভারতের দিকে এগিয়ে যাবে— 'ইম্ফল অপারেশন'— তাদের সামরিক ভাষায় 'অপারেশন-ইউ'— শুরু হবে।

মুখে হুকুম দেওয়া যত সহজ, কাজ তত সহজ ছিল না। জাপানি সেনানায়কদের নিজেদের মধ্যে ভুল বোঝাবুঝি ছিল। কেউ কেউ আজাদ হিন্দের বীরদের খুব একটা সুনজরে দেখত না, ভাবত, এরা আবার কী যুদ্ধ করবে? আর ছিল বার্মাতে ভারতীয়দের প্রতি বিদ্বেষের সমস্যা, কারণ তখন সেখানে বড়োলোক বেশির ভাগ ভারতীয়, উঁচু সরকারি পদেও বেশিরভাগ ভারতীয়। তবু বার্মায় নেতা বা-ম রাজি হলেন রেঙ্গুনে হেডকোয়ার্টার বসিয়ে নেতাজি যাতে তাঁর সরকার নিয়ে যুদ্ধ পরিচালনা করতে পারেন। ওদিকে থাইল্যান্ডে সেখানকার নেতা পিবুলসোংগ্রাম এতদিন জাপানিদের সঙ্গে থেকেছেন। স্বাধীনতাও

আদায় করেছেন ১৯৪৩-র ১৫ আগস্টে। কিন্তু এখন খুব একটা উৎসাহ দেখাচ্ছেন না জাপানিদের বন্ধুত্বে। জাপানি সেনাপতিরা অনেকে আজাদ হিন্দ ফউজ তাদের হুকুম শুনবে, না তারা ফউজের হুকুম শুনবে— এই নিয়ে কূটতর্ক করছে। নেতাজিকে ছুটে ছুটে বোঝাতে হচ্ছে সকলকে, কারণ একমাত্র তিনিই পারেন ওটা। একদিকে বার্মার প্রশাসক বা-ম, অন্যদিকে জাপানের সেনাপতির দল, আর-এক দিকে বার্মার জনগণ— সকলে তাঁর কথা শোনে, মানে। আবার রেঙ্গুনে বসে নিজের শক্তিশালী শর্ট-ওয়েভ রেডিয়োতে অন্যান্য জায়গায় যুদ্ধের খবর নিচ্ছেন। বুঝতে পারছেন, অক্ষশক্তির অর্থাৎ জার্মান-জাপান জোটের অবস্থা সুবিধের নয়। জাপানিরা যে রাজি হল ইম্ফল অপারেশনে, সেটাই আশ্চর্যের। বোধ হয় তারা যুদ্ধে কোণঠাসা হয়ে পড়েছে বলে দারুণ একটা জয়ের স্বাদ পেতে চায়। বছর দেড়েক আগে এই বার্মাতেই তারা ইংরেজ বাহিনীকে ছত্রভঙ্গ করে তাড়িয়ে দিয়েছিল। এখনও দেশটা তাদের পুরো দখলে। এই জয় নিশ্চয়ই তাদের সৈন্যদের আবার নতুন করে চাঙ্গা করে তুলবে।

যুদ্ধ শুরু হল ১৯৪৪-এর ১৫ মার্চ। শেষ হল ৯ জুলাই, ১৯৪৪। এ যুদ্ধের পরিণাম আমরা সকলেই জানি। প্রথম দিকে চমকপ্রদ কয়েকটি জয়, ভারতের মাটিতে এসে কোহিমা দখল, ইম্ফলের খুব কাছাকাছি ঝড়ের মতো অগ্রগতি। পুরো জয় যখন হাতের মুঠোয়, তখনই শুরু বিপর্যয়ের। পরাজয়ে যার শেষ।

যে জায়গায় যুদ্ধ সেখানে লোকজনের বসতি নেই, গভীর জঙ্গল, খাড়া পাহাড়, আর জোঁকে ভর্তি এবড়ো-খেবড়ো জমি। পথ নেই, পথ কেটে এগোতে হবে সৈন্যদের। অস্ত্রশস্ত্র, খাবারদাবার-এর সরবরাহের রাস্তা তৈরি করতে হবে, আহতদের চিকিৎসায় দ্রুত ব্যবস্থাও দাঁড় করাতে হবে। ব্রিটিশ বাহিনীর অধিনায়ক স্লিমের অধীনে আছে ১,৫৫,০০০ সৈন্য, আর জাপান আর আজাদ হিন্দ ফউজের সৈন্যের মিলিত সংখ্যা মাত্র ৯৫,০০০। আবার বর্ষাও খুব দূরে নেই, বর্ষায় এই জঙ্গলাকীর্ণ অঞ্চল ভয়াবহ হয়ে উঠবে। বর্ষা যখন এত কাছাকাছি তখন যুদ্ধ শুরু করাই বোকামি।

তবু জয় এল ধাপে ধাপে। কালাদান অঞ্চলে ব্রিটিশ বাহিনী মার খেয়ে পালাল, ৬ এপ্রিল পালে আর কোহিমাতে শাহ-নওয়াজের বাহিনী ভারতের মুক্ত ভূখণ্ডে গিয়ে স্বাধীন ভারত সরকারের পতাকা তুলল। আজাদি সৈন্যরা পতাকা অভিবাদন করেই মাটিতে লুটিয়ে চুম্বন করল দেশের মাটিকে। বুকে কপালে মেখে নিল দেশের মাটি, চোখের জলে ভিজিয়ে দিল সে মাটিকে। দিল্লি অনেক দূর, তবু এই একই দেশের মাটি ছুঁয়ে আছে দিল্লিকে। দেশের মাটিতেই রক্ত আর প্রাণ দিল কত ফউজি বীর।

ইম্ফল আর দূরে নয়! আর একটু এগোলেই সে শহর এসে যেতো হাতের মুঠোয়! তোকিয়োতে বসে উল্লসিত তোজো। শয্যাশায়ী রাসবিহারী বসু স্ট্রেচারে শুয়ে ছুটে এলেন রেডিয়ো স্টেশনে, 'ইম্ফলের পতন' বলে বক্তৃতা রেকর্ড করে গেলেন। হায়! সে বক্তৃতা আর প্রচার করার সুযোগ পেল না জাপানিরা।

ততদিনে সর্বত্র জাপানের পরাজয় শুরু হয়ে গেছে। আর তারা কেন চাইবে অন্য এক দেশের এই স্বাধীনতার লড়াইকে সাহায্য করতে? কী লাভ তাদের? অন্যদিকে ব্রিটিশ সৈন্যদের সাহায্য করছে এক বিশাল বিমান-বাহিনী। রসদ পৌঁছে দিচ্ছে, খাবার পৌঁছে দিচ্ছে। বোমা ফেলে, নীচে নেমে এসে মেশিনগানের গুলি চালিয়ে তছনছ করে দিচ্ছে জাপানিদের। জাপানের বিমান-বাহিনী বলতে কিছু নেই বললেই চলে। অন্তত ব্রিটিশ-আমেরিকানদের তুলনায়। যা আছে তা অন্য জায়গায় ব্যস্ত। জাপানি সেনাপতিরা একের পর এক ভুল করতে লাগল, বিপদের সময় যা হয়। তারা ইম্ফল দখল করতে পারল না, তখন তাদের ডিমাপুর দখলে এগিয়ে যাওয়া উচিত ছিল। ডিমাপুরে ছিল লক্ষ সৈন্যের জন্য প্রচুর খাবার আর অস্ত্রশস্ত্রের ভাণ্ডার। কিন্তু ইম্ফলে এগোতে গিয়ে প্রবল ধাক্কা খেতেই তারা পিছিয়ে যেতে লাগল বার্মার দিকে। আজাদ হিন্দ বাহিনীকেও বলল, আর নয়, তোমরাও পিছোও। আর আমরা জিততে পারব না। অথচ প্রায় অরক্ষিত ডিমাপুর দখল করতে পারলে আরও অন্তত একমাস যুদ্ধ চালানোর রসদ পেয়ে যেত তারা।

এই রসদ নিয়েই দেখা গেল জাপানি সৈন্যবাহিনীর নীচতা। তারা

আজাদ হিন্দকে খাবার-দাবার অস্ত্রশস্ত্র ওষুধপত্র সবই কম কম দিতে লাগল, নিজেদের জন্য রাখতে লাগল বেশি বেশি করে। একদিকে প্রবল বর্ষা, বৃষ্টির হাত থেকে পরিত্রাণ নেই। জ্বরে, অনাহারে, আরও নানা অসুখে একেবারে বিপর্যস্ত স্বাধীন ভারতের প্রথম বাহিনী। রেঙ্গুনে বসে নেতাজি পাগলের মতো খবর পাঠাতে লাগলেন জাপানি কর্তাদের কাছে। কিন্তু তারা তো তখন নিজেদের চামড়া বাঁচাতে ব্যস্ত। নেতাজি যুদ্ধের সব খবরই রাখছেন, নিজের উদ্‌বেগ লুকোনোর জন্য দৈনিক দু-তিন ঘণ্টা ব্যাডমিন্টন খেলে নিজেকে ক্লান্ত করে ফেলেছেন, কিন্তু দু-ঘণ্টার বেশি ঘুমোচ্ছেন না সারাদিনে। তাঁর কার্যালয়ে পোষা বাঁদর ছিল দুটি, একটি ছিল কাকাতুয়া— কখনও তাদের আদর করছেন গিয়ে। কাছে গেলেই বাঁদরটা তাঁর কাঁধে বসে তাঁর টুপি খুলে চুল ধরে টানত। নেতাজি বলতেন, 'ছাড়ু ছাড়ু, যে কটা চুল আছে তাও আর রাখবি না দেখছি।'

তোজো একদিন অনুরোধ করে পাঠালেন, 'নেতাজি, রেঙ্গুনও আমরা আর রক্ষা করতে পারব না, ব্রিটিশদের এরোপ্লেন বাহিনী রোজ এসে বোমা ফেলে আক্রমণ করছে। হাসপাতালকেও রেহাই দিচ্ছে না। আপনি ব্যাঙ্ককে চলে আসুন।'

নেতাজি তখনও ভাবছেন, জুনে কোহিমা ছেড়ে-আসা সাময়িক পিছিয়ে আসা মাত্র। একটু দম নিয়ে আজাদ হিন্দের বীর সৈন্যেরা আবার আক্রমণ করবে, জাপানও আবার রুখে দাঁড়াবে হয়তো। তিনি রেঙ্গুন ছাড়তে চাইছিলেন না। শেষে তাঁকে রাজি হতেই হল। বিশেষ করে ঝাঁসির রানি বাহিনীর প্রায় তিনশো মেয়ে রয়েছে, তাদের নিরাপত্তার কথা ভেবে আর আপত্তি করলেন না। বললেন, 'আমি যাব, কিন্তু আমার মেয়েদের আমারই সঙ্গে ব্যাঙ্ককে ফেরত পাঠাবার ব্যবস্থা করতে হবে। না হলে আমি যাব না।' যে বাবা ছোট্ট কয়েক সপ্তাহের শিশুকন্যাকে জার্মানিতে ছেড়ে চলে এসেছেন, সেই বাবা এই তিনশো মেয়েকে তাদের মা-বাবার কাছে ফিরিয়ে দেওয়ার জন্য ব্যাকুল। তাদের প্রত্যেকের হাতে রাইফেল, প্রত্যেককে দেওয়া আছে একটা শেষ বুলেট। অমর্যাদার সম্ভাবনা দেখলে তারা আত্মহত্যা করবে।

জাপান তখন বুঝে গেছে এ যুদ্ধে তাদের আর কোনো ভরসা নেই। তবু তারা সহজে মাটি ছাড়ছে না। তাদের বাহিনী এক সময় পৃথিবীর অর্ধেকটা প্রায় দখল করে নিয়েছিল, সে তো ম্যাজিক দিয়ে নয়। তারা প্রাণপণ বাধা দেবার চেষ্টা করছে ব্রিটিশ সৈন্যদের, অন্যদিকে আত্মসম্মান বজায় রেখে পালানোর আয়োজনও করছে। তাদের অবস্থা ভালো নয়। ট্রাক ও ট্যাঙ্ক অনেক নষ্ট হয়েছে, এরোপ্লেনও খুব বেশি হাতে নেই। তারা প্রথমে আপত্তি করল, শেষে নেতাজির ইচ্ছের কাছে তাদের মাথা নোয়াতেই হল।

রেঙ্গুন থেকে ব্যাঙ্কক প্রায় বারোশো কিলোমিটার পথ। নেতাজির যাওয়ার একেবারেই ইচ্ছে ছিল না। বোমার আঘাতে যদি তাঁর মৃত্যুও হয় এখানে তো হোক, এরকম কথা তিনি বারবার বলতেন। প্রায়ই বলেছেন, স্বাধীনতা নিজের চোখে দেখার জন্যে অনেকেই হয়তো বেঁচে থাকব না। না থাকি তো ক্ষতি কী? আমাদের রক্ত আর প্রাণের মূল্যে স্বাধীনতা আসবে, দেশের ভবিষ্যৎ নাগরিকেরা মুক্ত স্বাধীন আকাশে মাথা তুলবে— সেই স্বপ্নটাই আসল কথা।

তাঁর মনে পড়ল ২৩ জানুয়ারি তাঁর আটচল্লিশতম জন্মদিনের কথা। রেঙ্গুনের ভারতীয়রা তারই মধ্যে আনন্দে-উল্লাসে তাঁর জন্মদিন পালন করল, তাঁর সমান ওজনের সোনাদানা তাঁর যুদ্ধভাণ্ডারে দান করা হল। তারপরেই তিনি ছুটে গেলেন ইরাবতী নদীর ধারে যুদ্ধক্ষেত্রে। দেখলেন ফউজের প্রথম ডিভিশন আর জাপানি পঞ্চদশ ডিভিশন ট্রেঞ্চে বুক পেতে লড়াই করছে ব্রিটিশদের আক্রমণ ঠেকানোর জন্য। সেখানে কর্নেল কিয়ানিকে বললেন, 'আমি এখানে থেকে যেতে চাই, আমার ফউজি ভাইদের পাশে দাঁড়িয়ে লড়াই করে মরতে চাই।' সবাই হাত জোড় করে বলল, 'নেতাজি আপনার জীবন আমাদের সকলের জীবনের চেয়ে দামি। আপনাকে কি আমরা মরতে দিতে পারি? আমাদের প্রাণ থাকতে!'

ওই পিনমানা রণক্ষেত্র পরিদর্শনের সময় নেতাজিকে দেখে জাপানি সেনাপতি তাকাহাশি বলেছিলেন, 'বুঝতে পারিনি, লোকটি মানুষ, না অতিমানব। যুদ্ধের প্রত্যেকটি কেন্দ্র দেখছে, মিটিং করছে, স্থানীয়

ভারতীয়দের সঙ্গে কথা বলছে, চিঠি লিখছে, রেডিয়ো শুনে নির্দেশ দিচ্ছে— ২৪ ঘণ্টার একটা মুহূর্ত বিশ্রাম করছে না। কোনো স্বাভাবিক মানুষকে আমি এত পরিশ্রম করতে দেখিনি।'

সেই সব ছেড়ে যেতে হবে? হয়তো আবার নতুন করে শুরু করা যাবে যুদ্ধ। একবার সোভিয়েত ইউনিয়নের দিকে যেতে পারলে হত। এর আগেও তাদের সঙ্গে যোগাযোগ করবার চেষ্টা করেছিলেন নেতাজি। বিশেষ কোনো সাড়া পাননি। তবু যুদ্ধ তো শেষ করা চলবে না।

এখন এই মেয়েদের তাদের বাড়িতে পৌঁছে দেওয়া দরকার। ২০ এপ্রিল শুরু হল সেই ভয়ংকর যাত্রা। ট্রেনে তুলে দেওয়া হল মেয়েদের, তিনি সঙ্গে সঙ্গে চললেন গাড়িতে।

১০০ কিলোমিটারও যায়নি গাড়ি, সিত্তাং নদী এসে পড়ল। পাহারাদার জাপানি সৈন্যরা বলল, যে পন্টুন ব্রিজ তৈরি হয়েছে সেটা দুর্বল, গাড়ি তার ওপর দিয়ে যাবে না। গাড়ি ছেড়ে হেঁটে চললেন। সঙ্গী ইসোদা একটা ভাঙা ট্রাক জোগাড় করে আনলেন কোত্থেকে, বললেন, 'নেতাজি এটাতে চড়ে বসুন। নদীতে জল বেশি নেই, ট্রাক নদীর বুক পেরিয়ে যাবে।'

নেতাজি দেখলেন, মেয়েরা ট্রেন থেকে নেমে হেঁটে এসেছে, তাঁরা নদী হেঁটে পেরোবার জন্যে তৈরি। বললেন, 'তাই হয় নাকি? মেয়েরা হেঁটে নদী পেরোবে, আর আমি ট্রাকে?'

বুক জল ঠেরে নদী পেরোলেন। প্রায় এক হাজার কিলোমিটার হাঁটলেন। রোদ মাটি পুড়িয়ে দিচ্ছে, ব্রিটিশ-আমেরিকান এরোপ্লেন এসে মেশিনগানের গুলির ছড়ুরা ছুটিয়ে চারপাশ বিঁধে ফেলছে। তাঁর চোখের সামনে মৃত্যু বরণ করতে দেখলেন কয়েকজনকে। বুকের দুঃখ বুকে চেপে রেখে হাঁটছেন সেই 'লংমার্চ'! বোমা পড়ছে, মেশিনগানের গুলি ছুটছে, তারই মধ্যে বসে দাড়ি কামাচ্ছেন, বুট খুলে দেখছেন পায়ের ফোস্কাগুলো কত বড়ো হয়েছে, ভেতরে জোঁক ঢুকেছে কিনা। চারপাশে মৃত্যুর আক্রমণ, তার মধ্যে লোকটার যেন ভ্রূক্ষেপই নেই। যেন সে ধরেই নিয়েছে ইংরেজের গুলি আর বোমা তার চুলও ছুঁতে পারবে না।

বুকের দুঃখ বুকে চেপে রেখে হাঁটছেন সেই 'লংমার্চ'

শেষদিকে কিছুটা পথ গাড়িতে এসে থাইল্যান্ডের সীমানা পার হয়েছেন, এমন সময় শুনলেন (৮ মে, ১৯৪৫) হিটলার আত্মহত্যা করেছে। জার্মানিও আত্মসমর্পণ করেছে। তাঁর কপালে কয়েকটা ভাঁজ পড়ল, মুখে কিছু বললেন না। বুঝলেন, জাপানেরও আর বেশি দিন নেই। সোভিয়েত ইউনিয়নের কথাটা ক-দিন থেকেই মনের মধ্যে ঘুরছে।

৬ আগস্ট হিরোশিমাতে পড়ল অ্যাটম বোমা, ৯ আগস্ট নাগাসাকিতে। জাপানের দম শেষ হয়ে গেল।

পনেরো

নেতাজি তখন সিঙ্গাপুরে। ভাবলেন, এবার কী করব? ইম্ফল অপারেশন ব্যর্থ হওয়ার পরেই জুলাইয়ে তোজোকে প্রায় বরখাস্ত করা হল, ফলে জাপানের সর্বোচ্চ প্রশাসনে তাঁর বন্ধুও তেমন রইল না। তিনি এও শুনলেন যে, জাপান অবিলম্বে আত্মসমর্পণ করতে চলেছে। জাপান করে করুক। তাঁর আজাদ হিন্দ সরকার স্বাধীন সরকার, তাঁর আত্মসমর্পণের কোনো প্রশ্ন নেই। দ্রুত তাঁর সরকারের মন্ত্রীসভার একটি বৈঠক ডাকলেন। ঠিক হল, নেতাজি পরদিনই প্লেনে তোকিয়ো রওনা হবেন, তোকিয়ো থেকে চীনের মাঞ্চুরিয়ায় পৌঁছে যদি তিনি সোভিয়েত ইউনিয়নের সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারেন। কিন্তু তোকিয়ো পৌঁছোনোই এখন প্রথম কাজ।

জাপানি বিমান-বাহিনীর তখন খুবই বিধ্বস্ত অবস্থা। সকলে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া ছেড়ে ঘরে ফিরতে ব্যস্ত, কিন্তু যথেষ্ট প্লেন নেই। যেগুলো আছে সেগুলোর অবস্থাও ভালো নয়।

ছ-জন সঙ্গীকে নিয়ে যেদিন নেতাজি প্লেনে সিঙ্গাপুর থেকে ব্যাঙ্ককে এসে পৌঁছোলেন, ১৬ আগস্ট ১৯৪৫-এ— তার দুদিন আগে জাপান আত্মসমর্পণ করেছে। সেখান থেকে উড়ে এলেন ভিয়েতনামের সাইগনে। ১৭ আগস্ট। তাঁর ঘনিষ্ঠ সহযোগীরাও পৌঁছোলেন সাইগনে। সকালেই সাইগন থেকে প্লেনে প্রথমে যাবে ফরমোজার তাইপে-তে, সেখান থেকে মাঞ্চুরিয়ার দাইরেন-এ। যদি সেখানে সোভিয়েত কর্তৃপক্ষের সঙ্গে বোঝাপড়া করার সুযোগ হয় একটা।

সমস্যার পর সমস্যা। যে প্লেনটা পাওয়া গেল সেটা একটা দু-ইঞ্জিনের বোমারু বিমান, ৯৭-২ ধরনের। তাতে যা মালপত্তর চেপেছে, আর বেশি ওজন নেওয়া সম্ভব না। অনেক তর্কাতর্কির পর নেতাজির

সঙ্গে হবিবুর রহমানের ঠাঁই হল। বাকিদের নাকি পরে পাঠানো হবে, সেই কথা দাঁড়াল।

তার পরে? তার পরে কী ঘটল?

পরের যে-নিদারুণ ঘটনার কথা হবিবুর এবং দু-একজন বেঁচে যাওয়া জাপানি সঙ্গী জানিয়েছেন, সে কথা নেতাজির দেশের মানুষ অনেকেই বিশ্বাস করেননি। এখনও করেন না। তাঁরা বলেন, 'এ অসম্ভব কথা, এভাবে কেউ চলে যেতেই পারে না।' তবু সেই 'ঘটনা'র কথা তো বলা দরকার।

বিকেল পাঁচটা থেকে সাড়ে পাঁচটার মধ্যে প্লেন ছাড়ল। রাতটা বিশ্রামের জন্য তা ভিয়েতনামেরই তুরেন বিমানঘাঁটিতে গিয়ে নামল। এখন এই তুরেন-এরই নাম হয়েছে দা নাং। সেই রাত্রেই বিমানের পাইলট মেজর কোনো প্রায় ৬০০ কিলোগ্রাম মেশিনগান আর গুলিগোলা নামিয়ে দিলেন প্লেন থেকে। সাইগনে তাঁর প্লেন ওড়াতেই অসুবিধে হচ্ছিল অতিরিক্ত মালপত্রের জন্যে।

ভোর পাঁচটায় তুরেন ছাড়ল প্লেন। ১২০০০ ফুট ওপর দিয়ে উড়ে তাইপেতে (জাপানি নাম তাইহোকু) ঠিক সময়েই নামল। সেখানে মেজর কোনো লক্ষ করলেন, প্লেনের বা দিকের ইঞ্জিনটা একটু গড়বড় করছে। এখনও প্লেনে যাত্রী আর মালের ওজন বেশি, কিন্তু আর কিছু নামিয়ে দেওয়ার উপায় নেই। এর আগে নেতাজির শীত লেগেছিল, তিনি এবার হাবিবুরের কাছ থেকে একটি পশমের সোয়েটার চেয়ে নিলেন।

বেলা আড়াইটের সময় প্লেন আবার ওড়বার জন্যে দৌড় শুরু করল। মাটি ছাড়িয়ে সবে উঠেছে, মাটি থেকে ৩০ মিটার ওপরেও নয় প্লেন— এমন সময় এক প্রচণ্ড শব্দ শুনে বিমানঘাঁটি থেকে সব দৌড়ে এল। বাঁদিকে ইঞ্জিনের আর প্রপেলার ভেঙে পড়ে গেছে। দেখতে দেখতে প্লেনটাও এসে আছড়ে পড়ল মাটিতে।

মেজর কোনো লাফিয়ে বেরোলেন। ইঞ্জিন থেকে তাঁর গায়ে পেট্রোল ছিটকে পড়েছিল, তাতে আগুন ধরে গেল। হবিবুর জানাচ্ছেন, প্রবল আঘাতে তিনি প্রথমে অজ্ঞান হয়ে গিয়েছিলেন। জ্ঞান ফিরে আসাতে দেখলেন তাঁর নেতা প্রাণপণে চেষ্টা করছেন প্লেন থেকে

বেরোতে। তাঁর মাথায় আঘাত লেগেছে, রক্ত পড়ছে। কোনো রকমের টলতে টলতে তিনি বেরিয়ে এলেন, কিন্তু পেট্রোলে সর্বাঙ্গ ভিজে গিয়ে তারও পেশাক দাউ-দাউ করে জ্বলছে।

এই মানুষটিই শীত লাগবে বলে একটু আগে হবিবুরের কাছ থেকে সোয়েটার চেয়ে নিয়েছিলেন।

আঘাত আর পুড়ে যাওয়া শরীর নিয়ে সংজ্ঞাহীন ওই মানুষটিকে নানমোন সামরিক হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হল। পোড়ার ক্ষতে মলম দিয়ে সর্বাঙ্গে ব্যান্ডেজ পরিয়ে সবরকম চিকিৎসা করেও তাঁকে বাঁচানো গেল না।

হবিবুর বলেছেন, নেতাজির শেষ ক-টি কথা ছিল— 'দেশের মুক্তির জন্যে আমি আমার জীবন উৎসর্গ করলাম। দেশে গিয়ে দেশবাসীকে বলো, তাদের সংগ্রামে যেন ছেদ না ঘটে। আমি দেখতে পাচ্ছি, ভারত স্বাধীন হতে আর বেশি দেরি নেই।'

হবিবুরের কথা সত্য কি মিথ্যা— সেই তর্কে আমরা যাব না। তারপরে নেতাজির সৎকার হল, তোকিয়োতে রেনকোজি বৌদ্ধ মন্দিরে তাঁর চিতাভস্ম রাখা হল—সেগুলো এ একই বিবরণের অংশ।

এ মৃত্যু এদেশে অনেকেই স্বীকার করেননি, বিশ্বাস করেননি। নানা গুজব রটেছে তাঁকে নিয়ে। কেউ তাঁকে সোভিয়েত দেশে মস্কোতে দেখে এসেছে, কেউ এক সাধুকে ছদ্মবেশী নেতাজি ধরে নিয়ে হইচই ফেলে দিয়েছে কিছুদিন। কিন্তু নেতাজি কোথায়, কীভাবে বেঁচে আছেন তার বিশ্বাসযোগ্য প্রমাণ কেউ দিতে পারেনি।

আমরা বলব, মৃত্যু কি এরকম একটা মানুষকে মারতে পারে? মৃত্যুর এমন ক্ষমতা কোথায়? এখন সারা দক্ষিণ এশিয়ায়— ভারতে, পাকিস্তানে, বাংলাদেশে— দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ায়— মায়ানমার, থাইল্যান্ড, ভিয়েতনাম, ইন্দোনেশিয়া, মালয়েশিয়ায়—পুবে জাপানে পর্যন্ত— বহু মানুষের কাছে নেতাজি মৃত্যুর চেয়ে অনেক বড়ো, এক চিরমৃত্যুঞ্জয় মহাপুরুষ। সারা পৃথিবীর স্বাধীনতার যুদ্ধের এক অতুলনীয়, অভাবনীয় যোদ্ধা, তাঁর মতো একটিও দৃষ্টান্ত খুঁজে পাওয়া ভার।

যে মানুষটা এত সব অসাধারণ ছদ্মবেশ ধরে গেল সারা জীবন, মৃত্যুও তাঁর আর-একটা ছদ্মবেশ কিনা কে জানে?

'দেশের মুক্তির জন্যে আমি আমার জীবন উৎসর্গ করলাম

ষোল

নেতাজির জন্মের একশো বছর পার হয়ে গেল। ভারতের স্বাধীনতারও ষাট বছর হল। কিন্তু নেতাজি যে জন্যে সারাজীবন সংগ্রাম করে গেলেন, হাজার হাজার মানুষ যে জন্যে প্রাণ দিল, সেই স্বাধীনতা কি আমাদের হাতে এসেছে? হ্যাঁ, এখন আমাদের দেশের লোক দেশ শাসন করছে, সকলের ভোট নিয়ে তারা নির্বাচিত হচ্ছে। সেটা একটা পাওনা বটে। কিন্তু সেটাই সব? শুধু তারই জন্যে এত মানুষের এত ত্যাগ এত দুঃখবরণ এত অপঘাত এত মৃত্যু?

আর 'অহিংস' সংগ্রাম করেও এই 'স্বাধীনতা' আসেনি। যখন ব্রিটিশ আজাদ হিন্দ ফউজের হাতে নাকাল হল, তখন বুঝল— ভারতীয় সৈন্যবাহিনী আর তাদের কথা শুনবে না। মুম্বই-এ জাহাজি সৈন্যদের বিদ্রোহও তাদের হাঁড়ে কাঁপুনি ধরিয়ে দিল। তখনই তারা বুঝল, সাম্রাজ্যের দিন শেষ হয়ে এসেছে। তখনই তারা ভাবল, এবার তলপিতলপা গুটিয়ে বাড়ি ফেরাই ভালো।

পরাধীনতার একটা চেহারা নয়। মানুষের গরিব অবস্থার এক নাম পরাধীনতা— দেশে এখনও বহু লোক দু-বেলা পেট পুরে খেতে পায় না, পরার পোশাক পায় না, অসুখে চিকিৎসা পায় না। নিরক্ষরতা আর এক ধরনের পরাধীনতা, যা মানুষকে চোখ থাকতেও অন্ধ করে রাখে, অন্ধবিশ্বাস আর কুসংস্কার আর অজ্ঞতার শেকলে বেঁধে রাখে। জাতপাতের বিচার, ধর্মের নামে বাড়াবাড়িও বহু মানুষকে পরাধীন করে রাখতে চায়। এরকম কত পরাধীনতার রাজত্ব চলছে এখনও। সে সব থেকে মানুষ, দেশের সব মানুষ স্বাধীন করে হবে? নেতাজির জন্মের একশো দশ বছর পার হয়েও সেই উত্তরটা আমাদের পাওয়া দরকার। তিনি তো চেয়েছিলেন ওই সবরকমের স্বাধীনতা, সত্যিকার স্বাধীনতা।

তা আমরা কবে পাব? কেউ কি লাড্ডুর মতো আমাদের হাতে তুলে দেবে? নাকি আমরাই লড়াই করে ছিনিয়ে নেব ? দেশকে ভালোবাসি যদি এ প্রশ্ন আমাদের নিজেদেরকে করতেই হবে।

জয় হিন্দ

ছোটদের জন্য অতিশয় সহজ ও আন্তরিক ভাষায় লেখা, নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসুর একমাত্র প্রামানিক জীবনী।

লিখেছেন পবিত্র সরকার, ভারতের প্রখ্যাত ভাষাবিজ্ঞানী, প্রাবন্ধিক ও বহুমাত্রিক লেখক–ছোটদের লেখক হিসাবেও যিনি সন্মানিত।

এ বই ছোটদের কাছে এক মহৎ জীবনের মহৎ আদর্শকে তুলে ধরবে।